শুভদা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দুই টাকা আট আনা

নবম মুদ্রণ

বৈশাখ—১৩৬৩

শুভদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসিতে জল পূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

ঘাটে আরো তিন চারিজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক্ হইয়া ঠাকুরাণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাক্‌রুণকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিম্বা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা।

তাই বল্‌চি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকেই বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসিমা ?

এই হারাণ মুখুয্যের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্ছেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝিল হারাণ মুখুয্যের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে। সেও দুঃখিতা হইল। প্রায় একমাস হইল হারাণের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া বলিল, ভগবান কেড়ে নিলে মানুষের হাত কি ? আর জন্ম-মৃত্যু কার ঘরে নেই বল !

প্রথমে কথাটার অর্থ কৃষ্ণঠাকুরাণী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, আহা মাসখানেক হ'ল ছেলে মারা গেছে বটে ! সে কথা নয় বিন্দু, সে কথা নয় ; মরা-বাঁচা ভগবানের হাতই বটে কিন্তু এটা—তুই বুঝি কিছু শুনিস নি মা ?

বিন্দুবাসিনী কিছু বলিল না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পুনশ্চ বলিলেন, হারাণ মুখুয্যের কথা বুঝি কিছু শুনিস নি ?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আবার কিসের কথা।

আহা ! তাই ত বলছিলাম মা, ভগবান যখন মারেন তখন এমনি ক'রেই মারেন ; কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্সের জন্যে ত কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার কথা মনে হ'লে। হতভাগী ড্যাকরার হাতে পড়ে ত এক দিনের তরেও সুখী হ'ল না।

বিন্দু যেমন মুখপানে চাহিয়া ছিল তেমনি রহিল, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু ঠাকুরাণীরও এত কথা নিরর্থক বলা হয় নাই ; যেজন্য তিনি মূল কথাটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডালপালা ছড়াইতে ছিলেন তাহা সমাধা হইল। ঘাটে যতগুলি শ্রোতা ছিল কাহারও বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল, হারাণ মুখুয্যের এমন কি কথা হইতে পারে যাহা তাহারা জানে না, অথচ গ্রামের সকলেই জানে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্দু কহিল, পিসিমা, কথাটা কি শুনতে পাই নে ?

কেন পাবে না মা? কিন্তু এ ত আর সুখের কথা নয়—তাই বল্‌তে ইচ্ছে করে না, যখনই মনে পড়ে তখনি যেন বুকের মাঝখানটা টনটন করে ওঠে। আহা ভগবান অমন মেয়ের কপালেও এত কষ্ট লিখেছেন!

কিসের কষ্ট?

কষ্ট কি এক রকমের? কত রকমের কত কষ্ট কত যাতনা তা তোদের কি আর বলব?

তবু শুনিই না পিসিমা?

না এখন থাক। কিছুই চাপা থাক্‌বে না, সকলেই শুনতে পাবে—পেয়েছেও। কিছু আগে আর কিছু পরে—তোরাও সব শুনতে পাবি।

তুমিই বল না!

না না আর বলব না। পরের কথাতে আর থাকব না মনে করেছি।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, পিসিমা, আমরা কি তোমার পর? আমি জানি তুমি আমাকে বলবেই।

বিন্দু, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কি তবে মিথ্যা কথা বলব?

কিসের মিথ্যে কথা? মিথ্যে কথা কি তোমাকে বলতে বলেছি?

তবে কেমন করে বলা হয়? এই যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললাম, পরের কথায় আর থাকব না।

কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী চলিয়া গেলে সকলেই সকলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেহ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, বিশেষ ঠাকুরাণীকে এপর্য্যন্ত কেহ কখনো কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া যাইতে দেখে নাই। স্নান সমাপ্ত হইলে সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিল। বিন্দু বাটীতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মাতার নিকট আসিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন, বিন্দু এতক্ষণ ধরে কি জলে পড়ে থাকে মা, অসুখ হ'লে কি হবে বল দেখি ?

কি আর হবে,—দুদিন ভুগব !

বিন্দুর মাতা হাসিয়া বলিলেন, সোজা কথা এর জন্যে আর ভাবনা কি !

বিন্দু বলিল, মা, হারাণ মুখুয্যেদের আবার কি হয়েছে ?

কি আবার হবে ?

আজ ঘাটে কৃষ্ণ পিসিমার কথার ভাবে বোধ হয় তাদের নূতন কিছু একটা ঘটেছে। তুমি কি কিছু শোন নি ?

কিছুই না। কি বললে ?

বললে যে হারাণ মুখুয্যেদের ভগবান মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্চেন কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্সের জন্য ত কষ্ট হয় না—কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার জন্যে। এইটুকু বলে, আর কিছু বল্‌লে না। বলে, পরের কথায় আর থাক্‌ব না।

ঠাকুরুণের এতদিনের পর ধর্ম্মজ্ঞান জন্মেছে'!

মা, সত্যি তুমি কিছু জান না ?

কিছু না।

তবে আজ আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে যাব।

কেন ? কি দুর্ঘটনা ঘটেছে জানবার জন্যে ?

হাঁ—

তুই কি পাগল হয়েছিস্ ? যে কথায় উনি থাকতে চাইলেন না সে কথাটা তুই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাবি ?

উনি কে ?

বিন্দুর মা একটু ইতস্তত: করিয়া বলিলেন, এই কৃষ্ণঠাকুরুণ।

কৃষ্ণঠাকুরুণ কি আদর্শ, যে উনি যা না করবেন তা আর কাউকে কর্ত্তে নেই ?

এসব বিষয়ে তা একরকম আদর্শ বই কি।

তা হোক আমি যাব।

পরের কথায় না হয় নাই থাক্‌লে ?

আচ্ছা মা, একজন যদি ডুবতে থাকে 'পরের কথায় কাজ নেই' ব'লে তাকে আর তুল্‌তে নেই ?

তুই ত আর তুল্‌তে যাচ্ছিস্‌ নে বিন্দু ?

কে ডুবছে জানলে যাব বই কি ?

বিন্দুর জননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, তোমার ওদে বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। হারাণ মুখুয্যে লোক ভাল নয়, তোমার বাপে সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে ; তোম র কি ওদের বাড়ি যাওয়া ভাল দেখায় ?

হারাণ মুখুয্যে লোক ভাল নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি আর তার কাছে যাচ্চি নে। তার স্ত্রীর কাছে যেতে দোষ কি ? বে বুঝ্‌তে পাচ্চি ওদের কিছু একটা হয়েছে ; আমরা পাড়া প্রতিবেশী হ যদি এ সময়ে চোখ বুজে থাকি তাহ'লে শ্বশুর বাড়িতে আমার আর কে মুখ দেখবে না।

অঘোরনাথ কি তোকে পাড়ায় পাড়ায় কার কি হ'ল না হ' দেখে বেড়াতে বলেছে যে তুই ওদের বাড়ির সন্ধান না নিলে উনি আ তোর মুখ দেখবেন না ? আর আমি তোর মা হয়ে যা বারণ কচ্চি সেট কি শোনবার যোগ্য নয় ?

মা আমাকে যেতেই হবে !

গিয়ে কি শুনবে ? হারাণ মুখুয্যের কি হয়েছে তা বাড়ির কে জানে না।

তুমি কি ক'রে জানলে ?

তোমার বাপের কাছে শুনেছি।

তবে কি হয়েছে বল।

নন্দীদের তহবিল ভেঙ্গেছে ব'লে তারা হাজতে দিয়েছে।

নন্দীরা কারা ?

বামুনপাড়ার জমিদার। তাদের কাছারীতে হারাণ মুখুয্যে চাকরী রত।

কত টাকা চুরি করেছে ?

প্রায় দুশ টাকা।

কেউ জামিন হয় নি ?

কে আর হবে বল ? গাঁয়ে তোমার বাবাকেই সকলে জানে এবং উনিই কেবল জামিন হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁকে ত সে পোড়া মিন্সে ক্র করে রেখেছে। এঁকে একবার জামিন হ'তে ব'লেছিল, কিন্তু ীকার হন নি।

বিন্দু অনেকক্ষণ মৌন হইয়া কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, দুপুর-বলা একবার ওদের বাড়ি যাব। এসে পর্য্যন্ত বউকে একদিনও দখি নি।

বিন্দুর মাতা বিস্মিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বলিলেন, এত কথা নেও যাবি ?

বিন্দু যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল তাহাতে গৃহিণীর আর কথা কহা হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিন্দু পুনরায় কহিল, আমি ওদের বাড়ি গেলে কারও কোন ক্ষতি নাই। আমি এই বলি মা, পুরুষমানুষদের ঝগড়া মেয়ে মহল পর্য্যন্ত না পৌছুলেই ভাল।

বেলা হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন; যাইবার সম
বলিলেন, ইনি শুন্‌লে বড় রাগ করবেন।

যাতে না শুন্‌তে পান এম্‌নি ক'রে যাও।

নিশ্চয় শুন্‌তে পাবেন।

তুমি শোনালেই পাবেন।

কিন্তু শুন্‌লে বড় রাগ করবেন।

বিন্দু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, বাপ মা সন্তানের উপর রাগ করে
আবার ভুলে যান, সেজন্য তুমি ভেবো না মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ স্থানটার নাম হলুদপুব। গ্রামটি যে জেলায় তাহা আর বলি
কাহাকেও ক্লেশ দিতে চাহি না, কারণ এস্থানে কাহাকেও কথন যাইতে
হইবে না। এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই তবে
যদি নিতান্ত কৌতূহলী হইযা থাকেন ত আমার বিবরণ পড়িয়া যতা
পারেন উপলব্ধি করিয়া লউন।

শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্ব্বে অনেক ধনবান ব্যক্তিব নিবাস ছিল এব
তাহা সম্ভবও, কাবণ একে ত ইহা গঙ্গার উপবে স্থাপিত তাহার উপ
বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দিব, বেতবন ও স্যাকুল ঝোপে
মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত ভাবে মৌন-ব্রতধারী যোগী মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে
দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটা ঘাট-বাঁধা পুষ্করিণীর মধ্যে গরু বাছু
চরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও চোখে পড়ে। এই সকল দেখিয়া গ্রামে

চিরদিন যে এম্‌নি অবস্থায় কাটে নাই তাহা অনুমান হয় ; কিন্তু এখন কেবল দশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাটী আর পঞ্চাশ-ষাট ঘর চাষা-ভুষার কুটীর আর জঙ্গল এবং তাহারই মধ্যে দিয়া কদাচিৎ দুই এক ব্যক্তির যাতায়াতের পায়ে-হাঁটা পথ।

এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। বাটীটি দ্বিতল—পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত। উপর তলায় দুটি এবং নিম্নে চারি-পাঁচটি ঘর। চতুর্দ্দিকে একরাশ বাঁশঝাড, দুই-চারিটা কদলি বৃক্ষের ঝাড়, গোটা দুই বেলগাছ, গোটা দুই আমগাছ—একটা কতবেল গাছ—ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা ও পার্থিব সম্পত্তি।

হলুদপুরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীদের জমিদারী সরকারে মুখুয্যে মহাশয় চাকুরি করিতেন। কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইতেন কিন্তু ইহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত, এখন কিন্তু আর তাহাতে কুলায় না—সর্ব্বদা অনটন, সর্ব্বদা অভাব।

বাটীতে তাঁহার পোষ্যবর্গও অনেকগুলি ; স্ত্রী, দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এক বিধবা বড় ভগিনী অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর যাহা থাকে তাঁহারও ছিল। যখন তিনি মাসে কুড়িটা মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিতেন তখন তাঁহার সংসারে আজকালকার মত নিত্য দৈন্য নিত্য অভাব কেহই টের পায় নাই। স্ত্রী এবং বড় ভগিনী উভয়ে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইয়া লইতেন, এখন তাহা করেনও না, সংসারের নিত্য অনটনও কিছুতেই ঘুচে না। আজ চাউল নাই, আজ দাইল নাই, আজ কাষ্ঠ অভাবে রন্ধন হইতেছে না, নিত্য এ নাই, ও নাই, তা নাই-এ পড়িয়া মুখুয্যে মহাশয় অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিলেন অর্থাৎ সরকারি তহবিলের কিছু অংশ আপনার ব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী হারাণবাবুকে প্রথমে কেহ সন্দেহ পর্য্যন্ত করিল না, কিন্তু এ উপায় অধিক দিন চলে না ;

ক্রমশঃ জমিদারের সন্দেহ হইতে লাগিল; সন্দেহ যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিল তখন তিনি একদিন সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে চাহিলেন; খাতায় অনেক ভুল অনেক গোলমাল প্রকাশ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে চুরিও ধরা পড়িল। হারাণবাবু এযাবৎ বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; জমিদার শ্রীভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারাণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কত টাকা চুরি করেছ?

তা জানি না।

জান না? খাতাপত্র দেখে বোধ হয় তিন হাজারের উপরও চুরি করেছো—এত টাকা কি করলে?

খরচ করেছি।

খরচ ত করেছ কিন্তু চুরি করলে কেন?

কুড়ি টাকায় আমার চলে না; কাজেই চুরি করতে হয়।

কুড়ি টাকায় তোমার এতদিন চলেছে, এখন না চলবার কোন কারণ আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না; যাহোক তাই বা আমাকে বল নাই কেন যে তোমার কুড়ি টাকায় সংসার চলে না।

বললে কি আমাকে বেশি টাকা দিতেন?

হয় ত দিতাম, কিন্তু সে কথা যাক্; যা নিয়েছ তার অর্দ্ধেকও আমাকে ফিরিয়ে দিলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কেমন করে দেব, আমার কিছুই নেই।

তোমার কোন জমিজিরাত থাকে ত বিক্রয় করে দাও।

জমিজিরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাই বিক্রী করে নিন।

তোমার স্ত্রী-পুত্র থাকবে কোথায়?

গাছতলায়।

ভগবানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া হারাণ মুখুয্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার চোখ অত রাঙা কেন ?

কেমন করে জানব ?

তখন হারাণ মুখুয্যেকে বিদায় দিয়া অন্য একজন আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাণ মুখুয্যের বাটীর সংবাদ নিতে পার ?

কি সংবাদ নেব ?

এই রকম যে, ওদের সাংসারিক অবস্থা কেমন, কেমন সম্পত্তি আছে, কোনরূপ দেনাকর্জ্জ আছে কি না—এই সব !

এই লোকটি হারাণবাবুর অনেক কথা জানিত। সে বলিল, আমি যতদূর জানি মুখুয্যেমশায়ের সংসারের অবস্থা ভাল নয়, সম্পত্তিও বোধ হয় কিছুই নাই—তবে দেনাকর্জ্জ আছে কিনা বলতে পারি না।

ভাল করে সংবাদ নিয়ে আমাকে জানিও।

দুইদিন পরে সে বাবুকে জানাইল যে সাংসারিক অবস্থা যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব মুখুয্যেমশায়ের তাহা হইয়াছে, অন্যান্য সংবাদ পূর্ব্বে যাহা বিদিত করিয়াছিল সমস্তই সত্য।

ভগবানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখুয্যে কোনরূপ নেশাটেশা করে কি ?

আজ্ঞে হাঁ, গাঁজা খান।

তাই সেদিন চোখ অত রক্তবর্ণ দেখেছিলাম ; আনুষঙ্গিক আর কোন দোষ আছে কি ?

আমলা নতমুখে বলিল, শুনতে পাই আছে।

তবে এক কাজ কর—কাল কোর্টে গিয়ে চুরি অপরাধে মুখুয্যের নামে নালিশ করে দিও—পুলিশকেও সংবাদ পাঠিয়ে দাও।

পরিশেষে ফল এই দাঁড়াইল যে মুখুয্যে মহাশয়কে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইতে হইল।

নিকট হইলেও হলুদপুরের একথা প্রায় কেহই জানিতে পারিল না; তবে বিন্দুর পিতা ভবতারণ গাঙ্গুলি একথা জানিলেন; বোধহয় নন্দীরাই তাঁহাকে এ ঘটনা জানাইয়াছিল। তিনি সম্রান্ত এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোক, ইচ্ছা করিলে হারাণ মুখুয্যেকে অনায়াসে হাজত মুক্ত করিতে পারিতেন কিন্তু কিছুই করিলেন না। সহায়-সম্বলহীন মুখুয্যে মহাশয় হাজত গৃহেই পচিতে লাগিলেন। আর এক কথা—কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী এ ঘটনা যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন তাহা শুধু তিনিই বলিতে পারেন।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এই সময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধনশালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড় কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুজনেরই মুখ শুষ্ক; আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা; আর তাহার জননী—তিনিও এখন পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।

ললনা বলিল, মা, আজো বোধহয় বাবা আস্‌বেন না। মেঘ করে আস্‌চে, যদি জল হয় তা'হলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাক্‌বে না; তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

ললনার জননী বলিল, আরও একটু দেখি; তিন দিন আসেন নি—আজ যদি আসেন?

মা, বাবা এমনতর ত কখন করেন নি; তিন দিন আসেন নি—আজ যদি না আসেন?

কি কর্‌ব বল, ভগবান আছেন।

একাদশীর দিন রাসমণি (হারাণবাবুর বড় ভগিনী) বেলা করিয়া স্নান পূজা করিতেন; এখন নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, বৌ, এখন পর্য্যন্ত খাস্‌নি?

বৌ বিমর্ষ ভাবে কহিল, আরও একটু দেখচি।

আমার পিণ্ডি—আরো একটু দেখে কি হবে? ড্যাক্‌রা আজ এত বেলায় কি আর আস্‌বে? দেখ্‌ গে যা—গাঁজা খেয়ে ভোঁ হ'য়ে কোন মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। উপবাস করিয়া রাসমণির মেজাজটা একটু খিট্‌খিটে রকমের হইয়া পড়িত; কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া আরো একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, মুখপোড়া কবে মরবে যে আমাদের হাড় জুড়োবে।

এবার ললনার আর সহিল না। দুঃখিতভাবে বলিল, পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন?

একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন? কথাটা রাসমণির ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং রীতিমত লজ্জিত হইলেন; কিন্তু ছোট ললনা যে এ কথা বলিয়াছে ইহাতেই দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেলেন। তুই সেদিনকার মেয়ে বুড়ো মাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস্‌ নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না? বলিতে বলিতে রাসমণির নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল—বাছা আমার তিন দিন বাড়ি আসে নি—বুকের ভিতর যে কি কচ্চে তা ইষ্টদেবতাই জান্‌তে পাচ্চেন। অঞ্চল দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া, আমি বুড়ো মানুষ যদি একটা কথা বলি তা হলে তোরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস্‌!—কাজ নেই মা, আমি তোমার কোন কথায় আর থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা ম'রে যায় তাই দুকথা বলতে হয়।

ললনা অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার একটা কথায় এত গভীর অর্থ এবং আনুষঙ্গিক ক্রন্দনাদির কারণ ঘটিতে পারে সে নিজেই জানিত না। —পিসিমা আমার ঘাট হয়েছে, এমন কথা আমি আর বল্‌ব না। বাস্তবিক

কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। তাহার জননীও বলিলেন, মা, বড় হয়েছ সব কথা বুঝে বল্‌তে পার না!

তাহার পর সকলের পীড়াপীড়িতে ললনার জননী কিঞ্চিৎ আহার করিলে, বিন্দুবাসিনী আপনার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া হারাণবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই রাসমণি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বিন্দু এদিকে আর আসে না।

বিন্দু অপ্রতিভ হইবার লোক নহে; সেও সহাস্তে বলিল, তুমিই কোন্ আমাদের ওদিকে যাও দিদি?

যাবার কি আর যো আছে বোন, ছোট ছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক পাও কোথাও নড়বার সাধ্যি নেই।

কি হয়েছে তার?

জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকি নেই।

বৌ কোথায়?

এই এতক্ষণে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ওঘরে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসেছে।

এত বেলা হ'ল কেন?

হারাণের পথ চেয়ে; সে ত তিন দিন থেকে আর বাড়ি আসে নি। যদি আসে, আরো একটু দেখি—এইরকম ক'রে এতটা বেলা হয়ে গেল।

বিন্দু সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া যে ঘরে বৌ তাহার পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র মাধবের শিয়রে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল সেইখানে প্রবেশ করিল। মাধব হারাণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র; সে আজ এক বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহায় পীড়িত

শয্যাশায়ী পড়িয়া আছে। পীড়া তাহার এমন কিছু কঠিন নহে; রীতিমত চিকিৎসা হইতে পাইলে এতদিন আরোগ্য হইয়া যাইত কিন্তু অর্থাভাবে কিছুতেই সুচিকিৎসা হইতে পাইতেছে না। সামান্য টোটকা ঔষধ, পাঁচন ও কুইনাইনের উপর ভর করিয়া সে কিছুতেই বসিতে পারিতেছে না। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দুটি জননীর মুখের পানে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, মা, বাবা আজ তিন-চার দিন আমাকে দেখ্‌তে আসেননি কেন?

তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েছেন মা?

জননী অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমার ওষুধ আন্‌তে গেছেন। বালক প্রফুল্ল হইয়া বলিল, মিষ্টি-ওষুধ যেন আনেন, তেতো-ওষুধ আমি আর খেতে পারিনে। দেখ মা, ভাল হ'য়ে আমার আগেকার মত আবার বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আগ্রহে আবার বলিয়া উঠিল, মা আমি ভাল হব ত?

জননীর চক্ষে জল আসিতেছিল, তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, জগদীশ্বরের মনে কি আছে তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বিন্দু তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল, কেন ভাল হবে না বাবা? আমি কাছে থেকে তোমাকে সারিয়ে দোব।

মাধব কিম্বা তাহার জননী কেহই এ পর্য্যন্ত বিন্দুর আগমন লক্ষ্য করেন নাই, সহসা দুইজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

বিন্দু শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল, শুভদা খেয়েচিস্‌ ত?

হারাণবাবুর স্ত্রীর নাম শুভদা; বিন্দু তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও সম্মুখে নাম ধরিয়াই ডাকিত। শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তোর বড় মেয়ে কোথা?

বোধ হয় ওপরে আছে।

তবে একবার ডাক, বলিয়া নিজেই ডাকিল, ললনা—ও ললনা

ললনা উপর হইতে বলিল, কেন ?

একবার নেমে আয় ত মা ?

ললনা আসিলে তাহার হাতে কন্যাকে দিয়া বলিল, প্রমীলাকে নিয়ে একবার ছোট ভাইটির কাছে বস ত মা, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল ; তোর মার সঙ্গে ও-ঘর থেকে দুটো কথা কয়ে আসি।

প্রমীলাকে ললনার হাতে দিয়া শুভদার হাত ধরিয়া বিন্দু একেবারে উপরে আসিয়া বসিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌ, হারাণদাদা আজ ক'দিন বাড়ি আসেননি ?

তিন দিন।

কেন আসেননি কিছু জানিস্ কি ?

না, কিছু না।

বিন্দুবাসিনীর কথার ভাবে তাহার ভয় করিতেছিল। পাছে সে কিছু একটা বলিয়া ফেলে। বিন্দুবাসিনী মৌন রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, শুভদাও ততক্ষণ ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিন্দু বলিল, শুভদা, ইচ্ছে থাক্‌লেও এমন অনেক কথা আছে যা মিষ্টি করে বলা যায় না—জানিস্ ত ?

শুভদা শুষ্ক মুখে বলিল, জানি—কেন ?

হারাণদাদা আজ তিন-চার দিন বাড়ি আসেন নি ;—মনে কর্ যদি তার সম্বন্ধেই কোন অশুভ কথা বলতে হয়।

শুভদার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল ;—তিনি বুঝি বেঁচে নাই ?

ওকি কাঁপছিস্ কেন ? কে বল্লে তিনি বেঁচে নেই ?

বেঁচে আছেন ?

বালাই বেঁচে কেন থাক্‌বেন না ? বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে শুনিতে পাইল, তথাপি শুভদা কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ?

সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন ক'রে বলি ?

শুভদা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া বলিল, অমন আর করব না। কি হয়েছে বল ?

চুরি করেছেন ব'লে নন্দীরা হাজতে দিয়েছে।

হাজতে দিয়েছে ? শুভদার সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—তবে কি হবে ?

বিন্দুবাসিনী স্বাভাবিকস্বরে বলিল, কি আর হবে ? খালাস ক'রে আন্‌তে হবে ?

তা কি হয় ?

হয় না ত কি হাজতে গেলেই লোকে জেলে যায় ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভদা বলিল, বিন্দু, তোমার বাপের কাছে একবার যাব।

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। সে জানিত শুভদার মুখ দেখিলে পাষাণ গলিবে কিন্তু ভবতারণ গাঙ্গুলি গলিবে না। তাই অমত করিয়া বলিল, গিয়ে কি হবে ?

আমাদের কেউ নেই ; তিনি যদি দয়া ক'রে কোন উপায় করে দেন।

যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন ; হারাণদাদাতে বাবাতে চিরকাল শত্রুতা, তাই বাবার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।

তবে উপায় ?

উপায় আমি করে দোব। না হলে কি শুধু এই খবরটাই দিতে এসেছি? কিন্তু আমি যা বলব করতে পারবে?

পারব।

যতই শক্ত হোক?

শুভদা দৃঢ়স্বরে বলিল, হাঁ।

তবে শোন, দুশ না তিনশ টাকা চুরি করেছেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেছে।

দুশ-তিনশ টাকা! শুভদার ভ্রম হইল, এত টাকা কি এক সঙ্গে মানুষে চুরি করিতে পারে? আর চুরি করিলেই বা রাখিবে কোথায়?

এত টাকা বিন্দু তিনি কখন চুরি করেন নি।

না ক'রে থাকেন ভালই, কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিয়ে খুব অনুনয়-বিনয় করলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? এত টাকা আমি পাব কোথায়?

সে কথা আমি বলচি। বৌ, এখন লজ্জার সময় নয়; তুমি আমার এই বালা দুগাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যাও; তার পর যা ভাল বোঝ ক'রো।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার বালা দুগাছা?

হাঁ, আমার বালা দুগাছা! এর দাম তিন-চারশ টাকা হবে; এই দিয়ে সাধ্যি-সাধনা করলে দয়া ক'রে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিন্দু—

কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচাও তারপর কিন্তু ক'রো। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই-বা ভাবনা কি, তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে?

আজই যাব ?

হাঁ—আজই।

কার সঙ্গে যাব ?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি !

কেউ না।

তবে একলাই যাও। বরং একলা যাওয়াই ভাল ; কেন না পাঁচজনে শুন্‌লে পাঁচটা কথা বলতে পারে।

তবে আজ যাই।

হাঁ—আজই যাও। সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় প'রে মুখ ঢেকে যেয়ো।

কাল এমনি সময় আর একবার আস্‌ব। যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা না হলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বৌ আমি তোর মার পেটের বোন। আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাতক এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস।

নিচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা বাড়ি যাই। তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তখন দ্বিপ্রহরের সময় যে সব মেঘ বাতাসের দৌরাত্ম্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহা-সমারোহে বাজনা বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে—প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপাল দোষে আজ এই দুর্য্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে আবার গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দুগাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া, একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্ব্বে আর কখন বামুনপাড়া যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে উত্তর মুখ ধরিয়া চলিলে আধ ক্রোশ দূরে পাকারাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পৌঁছিতে পারিলে জমিদার বাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সে শুনিয়াছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকা রাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল; এক ফোঁটা দুই ফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিয়া শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পথ চলা আর অসম্ভব; অন্ধকারে একহস্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল চতুর্দ্দিক হইতে

আজই যাব ?

হাঁ—আজই ।

কার সঙ্গে যাব ?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি !

কেউ না ।

তবে একলাই যাও । বরং একলা যাওয়াই ভাল ; কেন না পাঁচজনে শুন্‌লে পাঁচটা কথা বলতে পারে ।

তবে আজ যাই ।

হাঁ—আজই যাও । সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় প'রে মুখ ঢেকে যেয়ো ।

কাল এমনি সময় আর একবার আস্‌ব । যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল । বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয় । তা না হলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে ।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বৌ আমি তোর মার পেটের বোন । আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাতক এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস ।

নিচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা বাড়ি যাই । তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তখন দ্বিপ্রহরের সময় যে সব মেঘ বাতাসের দৌরাত্ম্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহা-সমারোহে বাজনা বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে—প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপাল দোষে আজ এই দুর্য্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে আবার গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দুগাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া, একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্ব্বে আর কখন বামুনপাড়া যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে উত্তর মুখ ধরিয়া চলিলে আধ ক্রোশ দূরে পাকারাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পৌঁছিতে পারিলে জমিদার বাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সে শুনিয়াছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকা রাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল; এক ফোঁটা দুই ফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিয়া শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পথ চলা আর অসম্ভব; অন্ধকারে একহস্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল চতুর্দ্দিক হইতে

বন্য জীবজন্তু ছুটিয়া আসিয়া সেই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চিৎকার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে। শুভদার সহসা মনে হইল যদি চোর ডাকাইত কেহ আশ্রয় লইতে এইখানেই আসিয়া পড়ে? তাহা হইলে? তাহার প্রাণের ভয় হইল না কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান বালা দুখানির জন্য ভয় হইল। স্বামীর নিষ্কৃতির কারণ, নিজের আশা ভরসা সমস্তই এই বালা দুগাছি। সত্রাসে শুভদা বৃক্ষতল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সমস্ত শরীর কর্দ্দমসিক্ত হইয়াছে, গাছপালার আঁচড়ে ও কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তথাপি শুভদা পথ বহিয়া চলিতে লাগিল। এক নিমিষের তরে বৃষ্টির উপশম নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্য মেঘের শব্দের বিরাম নাই, কোন মুখে কোথায় চলিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই তথাপি বনবাদাড় সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল যেন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ সম্মুখে দেখা যাইতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটিয়া আসিয়া শুভদা দেখিল যথার্থই পাকা পথ পাইয়াছে। এখন কিন্তু অন্য কথা। যখন পথ পায় নাই তখন কেবল পথের ভাবনাই ভাবিয়াছিল, এখন কাজের কথা মনে হইতে লাগিল। এত রাত্রে কি করিয়া দেখা হইবে, দেখা হইলেই কি কার্য্যসিদ্ধি হইবে? সিদ্ধ হউক আর না হউক এ দুর্য্যোগে বাটীই বা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব। ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল; কিছুদূর আসিয়াই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও চতুর্দ্দিক সংলগ্ন রেলিং দেওয়া বাগান দেখিয়া বুঝিতে পারিল ইহাই নন্দীদের বাটী, কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? আর প্রবেশ করিলেই বা তাঁহার সহিত এত রাত্রে কি করিয়া সাক্ষাৎ করিবে। শুভদার কান্না আসিল; এখন কি হইবে? কি করিয়া বাড়ি যাইবে? পরিশ্রমে, অনাহারে, দুর্ভাবনায় সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, নন্দীদের বাটীর সম্মুখে যে শিবমন্দির ছিল তাহারই বারান্দার

উপর আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই, তবে কমিয়া আসিয়াছিল। বৈশাখের মেঘ যেমন এক মুহূর্ত্তে গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তেমনিই এক মুহূর্ত্তে গগন ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এ মেঘও দেখিতে দেখিতে আকাশের প্রান্তদেশে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আবার চাঁদের আলোকে জগৎ অনেক শুভশ্রী ধারণ করিল। শুভদা মনে করিল এইবার ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সিক্তবস্ত্র একটু গুছাইয়া লইবার সময় দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ, ভৃত্য হস্তে দীপ লইয়া জমিদার বাটীর ফটক খুলিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার নিকট যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ একটা ক্ষীণ আশায় ভর করিয়া শুভদা প্রস্থান না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ প্রথমে অবগুণ্ঠন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল, কোন ভদ্র ঘরের স্ত্রী জলের ভয়ে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, এইবার চলিয়া যাইবে কিন্তু এখনো সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না।

কোথায় যাবে বাছা?

শুভদার কথা বলিতে লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু এখন মৃদুকণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুদের বাড়িতে।

জমিদারদের বাড়ি ত এই সামনেই; তবে সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শুভদা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারদের বাড়িতে কার কাছে যাবে ?

বাবুর কাছে।

কোন্ বাবুর কাছে ?

ভগবানবাবুর কাছে।

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, ভগবানবাবুর কাছে ?

হাঁ।

তবে আমার সঙ্গে এস। বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। শুভদা জ্যোৎস্নালোকে বৃদ্ধের পলিত কেশ, সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া অসঙ্কোচে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া, বাগান পার হইয়া, একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ ডাকিল, এই ঘরে এস।

শুভদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষ, সমস্ত মেজের উপর মূল্যবান কার্পেট বিছানো ; সম্মুখে মসলন্দ পাতা তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। বৃদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিয়া শুভদার আপাদমস্তক দীপালোকে, অবগুণ্ঠনের ঈষৎ ফাঁক দিয়া যতদূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল। শুভদা সময়ে রূপবতী ছিল। বয়সে ও দুঃখে কষ্টে পূর্ব্বের সে জ্যোতি এখন আর নাই, তথাপি হীনপ্রভ লাবণ্যের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, বৃদ্ধ তাহাতেই মোহিত হইল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিল, বাছা, তোমার ভুল হয়েছে, বিনোদবাবুর সঙ্গে বোধ হয় তুমি দেখা করতে চাও।

বিনোদবাবু কে ?

বিনোদবাবু ভগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুভদা কহিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

তবে কি ভগবানবাবুর নিকট প্রয়োজন আছে ?

হাঁ।

ভগবান নন্দী আমারই নাম ; কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে আমার নিকট কি প্রয়োজন থাকতে পারে ?

শুভদা কথা কহিল না। ভগবানবাবু আবার বলিলেন, আমি ভেবে-ছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের নিকট থাকতে পারে ; এত রাত্রে আমার নিকট যে তোমার কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

তথাপি শুভদা কোন উত্তর দিল না।

তোমার বাড়ি কোথায় ?

হলুদপুরে।

হলুদপুরে ? আমার নিকট প্রয়োজন ? তুমি কি হারাণের স্ত্রী ?

শুভদা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তবে বল কি প্রয়োজন ?

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দুগাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানবাবুর পায়ের নিকট রাখিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, তাঁকে ছেড়ে দিন।

বৃদ্ধ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বালা দুগাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন, তবুও সুখী হলাম যে সে তোমাকে এটাও দিয়েছিল। তাহার পর বালা দুটি নিচে রাখিয়া বলিলেন, তুমি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা নিতে চাই না। ছেড়ে দিতে হয় অমনিই দেব ; বিশেষ সে আমার যা নিয়েছে তাতে এ অলঙ্কার নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও যা, না নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও তা।

শুভদা চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাঁকে ছেড়ে দেবেন ত ?

ইচ্ছা ছিল না। সে যে রকম দুশ্চরিত্র তাতে তার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তবুও তোমার জন্য ছেড়ে দেব।

শুভদার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। পলিতকেশ বৃদ্ধকে সে ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মুখ ফাটিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে সাহস করিল না; মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া, ঈশ্বরের চরণে তাঁহার সহস্র মঙ্গল কামনা করিয়া, যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজই বাড়ি যাবে?

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আজই যাইবে।

তোমার সঙ্গে আর কেউ লোক আছে?

কেউ না।

কেউ না? তবে এত রাত্রে একা যেও না। একজন লোক সঙ্গে নিয়ে যাও।

শুভদা তাহাও অস্বীকার করিয়া একাকী সেই বনের ভিতর দিয়া বাটী ফিরিল।

যখন বাটীতে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ললনা ইতিপূর্ব্বে উঠিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সিক্তবস্ত্রে জননীকে দেখিয়া কহিল, মা, এত ভোরে স্নান ক'রে এলে?

হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামমণি ও দুর্গামণি নাম না রাখিয়া যে শুভদা কন্যা দুইটির নাম ললনা ও ছলনা রাখিয়াছিল তাহাতে ঠাকুরঝি রাসমণির আর মনস্তাপের অবধি ছিল না।

বাজারের তাহাদের মত ললনা ছলনা নাম দুইটা অষ্টপ্রহর তাঁহার কর্ণে বিঁধিতে থাকিত। ললনা নামটা তবু কতক মাফিক সই; কিন্তু ছিঃ—ছলনা আবার কি নাম! ছলনাকে না দেখিতে পারার কারণ অর্দ্ধেক তাহার ঐ নামটা! লোকে ঠাকুরদের নামে ছেলে মেয়ের নাম রাখে; কেন না তাহাদের ডাকিতেও ভগবানের নাম করা হয় কিন্তু এ দুইটা মেয়েকে ডাকিলে যেন পাপের ভার একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে মনে হয়।

ললনাময়ী, ছলনাময়ী হারাণবাবুর দুই কন্যা। একজন বড়, একজন ছোট; একজন সপ্তদশ বর্ষীয়া, একজন একাদশ বর্ষীয়া; একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া।

এই ত গেল পরিচয়ের কথা। এখন রূপগুণের কথা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে গঙ্গার ঘাটে ললনা স্নান করিতে যাইলে, বর্ষীয়সীরা বলাবলি করিতেন, 'ঠাকুর বিধবা করবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছিলেন!' ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ডুব দিতে থাকিত। সমবয়স্কারা কানাকানি করিত। কি বলিত তাহারাই জানে, তবে ভাবে বোধ হয়, বিশেষ প্রশংসা করিত না। ললনার তাহাতে কিছু আসে যায় না। সে বেশি কথাও কহিত না, বেশি কথায় থাকিতও না—দুই চারিটি কথা কহিত, স্নান করিত, জল লইত, উঠিয়া বাটী চলিয়া আসিত; কিন্তু ছলনার স্বতন্ত্র কথা। সে অধিক কথা

কহিতে ভালবাসিত, অধিক কথায় থাকিতে ভালবাসিত, আটটার সময় স্নান করিতে গিয়া এগারটার কম বাটী ফিরিয়া আসিত না, গায়ে গহনা নাই বলিয়া মুখ ভারি করিত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া কলহ করিত, পাতে মাছ নাই কেন, বলিয়া থালাসুদ্ধ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত, এইরূপে দিনের মধ্যে শত সহস্র কাজ করিত। তাহারও শরীরে রূপ ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপ পুষ্পের মত মুখখানি। তাহাতে ভ্রূদুটি যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করা, পাতলা দুখানি ঠোঁট পান খাইয়া লাল করিয়া দর্পণ লইয়া নির্জ্জনে ছলনাময়ী আপনার রূপ দেখিয়া আপনি গৌরবে ভরিয়া উঠিত। মনে মনে বলিত, এই বয়সে এত রূপ না জানি বয়স কালে কি হইবে! সমস্ত অঙ্গে অত গহনা থাকিবে; এইখানে বালা, এইখানে অনন্ত, এইখানে বাজু, এইখানে হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরি, দশনরি, বিশনরি, আরো কত কি—উঃ তখন কি হইবে! এ আনন্দ ছলনা একা বহিতে পারিত না, ছুটিয়া দিদির কাছে আসিয়া বসিত। ললনা জিজ্ঞাসা করিত, কি লা? ছুটচিস্ কেন।

দিদি, আমার রংটা কি আগেকার চেয়ে কালো হ'য়ে গেছে?

কালো হবে কেন?

হয় নি? আচ্ছা দিদি, আমাদের গাঁয়ে কেউ গুণ্‌তে জানে কি?

কেন?

আমি হাত দেখাব।

কেন?

তারা গুণে ব'লে দেবে বড় হ'লে আমার গয়না হবে কি না!

ললনার চক্ষে জল আসিত—হবে দিদি হবে; তুই রাজরাণী হবি।

ছলনার লজ্জা করিত। মুখখানি লাল করিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইয়া

যাইত! গহনা হইবে কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল; রাজরাণীর কথা কে বলিয়াছে?

কখন আসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন?

ললনা বলিত, আমরা দুঃখী তাই।

কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন ক'রে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ঈশ্বর যাকে যেমন ক'রেছেন তাকে তেমনি করেই থাক্‌তে হয়।

ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না কেবল আমাদেরি এমন করলেন?

আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপ।

কি পাপ দিদি?

পাপ কি এক রকম আছে বোন? হয়ত কত অকর্ম্ম করেছি। বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি নি, লোকের মনে অযথা ক্লেশ দিয়েছি—আরো কত কি হয়ত করেছি।

ছলনার মুখ ম্লান হইল। বলিল, এমনি ক'রেই তবে কি চিরকাল কাট্‌বে? কখন কি সুখ হবে না?

তা কেন ভাই, দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে। তাহার পর ছলনার হাত দুটি সস্নেহে আপনার হাতে লইয়া বলিত, দেখিস্ দেখি—তোর কত সুখ হবে; কত ঐশ্বর্য্য, কত গহনা, কত দাস-দাসী—তুই রাজরাণী হবি।

ললনা এ কথাটা যখন তখন বলিত। ছলনা না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলিল, দিদি তুমি?

সে জানিত তাহার দিদি বিধবা, তথাপি বালিকাসুলভ চপলতায় একটা কথা আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই ছলনা অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও সুখে থাক্‌ব বোন—ঐ আমাকে মা ডাক্‌চেন।

ললনা চলিয়া গেল। যথার্থই মা তখন ডাকিতেছিলেন। কাছে আসিয়া বলিল, কেন মা?

তোমার বাবা এসেছেন, ঐ ঘরে—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ললনা চলিয়া গিয়াছে।

আহার করিতে বসিলে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

মুখে গ্রাস তুলিয়া হারাণচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে অনেক কথা!

রাসমণি মুখ ব্যাদান করিলেন, অনেক কথা কি রে?

সে গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হারাণবাবু পূর্ব্বমত গম্ভীর মুখেই বলিলেন, অনেক কথা এই যে মাথার উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় ব'য়ে গিয়েছে।

রাসমণির বিস্ময়ের সীমা নাই, ভাবনার শেষ নাই; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, খুলেই বল্ হারাণ।

হারাণচন্দ্র গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিল, নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান? আমার তাই হয়েছিল! চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

নালিশ করেছিল?

হাঁ নালিশ করেছিল, কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হ'ল না—আজ মকদ্দমা জিতে তাই বাড়ি আসচি।

ঘোমটার অন্তরালে শুভদা চক্ষু মুছিল। রাসমণি নন্দীদের বহু মঙ্গল কামনা করিলেন, তাহাদিগকে সগোষ্ঠী মুক্তি দিবার জন্য দুর্গার চরণে অনুযোগ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু ওরা চাকরিতে তোকে আর রাখবে কি?

হারাণচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—চাকরিতে রাখ্‌বে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর এজন্মে আমি আর মুখ দেখব? যদি বেঁচে থাকি ত প্রতিশোধ নেব—আমাকে যেমন অপমান করেছে, তার শোধ তুল্‌ব।

রাসমণি কিছুক্ষণ ভয়-বিস্মিত চক্ষে স্বীয় ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া, মৃদু মৃদু বলিলেন, তাহ'লে কিন্তু খরচ-পত্রের—

সে ভাবনা ভেব না দিদি—বেটা ছেলে, আমার ভাবনা কি? কালই আর এক জায়গায় চাকরি জুটিয়ে নেব।

হারাণচন্দ্রের কথা যে রাসমণি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন তাহা নহে, তথাপি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া এ দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এ সময়ে সকলেরই ইচ্ছা হয়। রাসমণিও তাহাই করিলেন; মনকে প্রবোধ দিলেন; হয়ত সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিবে; এ বিপদের সময়ও অন্ততঃ চক্ষু ফুটিবে। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, যা ভাল হয় তাই করিস্‌—না হ'লে, অসুখ-বিসুখ, কাচ্চা-বাচ্চা নিঁয়ে বিপদের সীমা পরিসীমা থাকবে না।

একটা লম্বা-চওড়া উত্তর দিয়া হারাণচন্দ্র আহার শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে শুনিয়াছিল পিতা আসিয়াছেন তাই এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শয্যার উপর বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্র নিকটে আসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন; কেমন আছ মাধব?

আজ ভাল আছি বাবা; তুমি এত দিন আস নি কেন?

হারাণচন্দ্র একটা মনোমত উত্তর খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মাধব সেজন্য অপেক্ষা করিল না। আবার বলিল, তুমি আমার জন্যে ওষুধ আন্‌তে গিয়েছিলে, না? ওষুধ এনেছ?

হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বলিলেন, এনেছি।

ভাল ওষুধ? খেলেই ভাল হব?

হবে বৈকি।

বালক প্রফুল্ল হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, তবে দাও।

হারাণচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এখন নয় রাত্রে খেয়ো।

বালক তাহাতেও সন্তুষ্ট। মৃদু হাসিয়া বলিল, বাবা, আমাকে একটা ডালিম কিনে দিও—দেবে?

হারাণচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দেব।

তাহার পর শুভদা আসিলেন, তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে আনা দুই পয়সা দিতে পার?

কেন?

আমার দরকার আছে—একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে।

শুভদা বাক্স খুলিয়া দুই আনা পয়সা বাহির করিল। হারাণচন্দ্র উঁকি দিয়া দেখিল বাক্সে অনেকগুলি পয়সা আছে। হাত পাতিয়া দুই আনা পয়সা লইয়া বলিলেন, থাকে ত আরো আনা চারেক পয়সা দাও—মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেব।

শুভদা কাতরভাবে স্বামীর মুখপানে একবার চাহিল। এতগুলি পয়সা একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে বোধ হয় তাহার ক্লেশ হইতেছিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল।

পয়সাগুলি হাতে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া হারাণচন্দ্র একটু জোর হাসিয়া বলিলেন, কালই আমি এসব শোধ করে দেব।

শুভদা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। সে বিলক্ষণ জানিত, তাহার

স্বামীর অর্দ্ধেক কথার কোন অর্থই থাকে না। এখন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া শুভদা বলিল, এখন কোথাও যেয়ো না—একটু শুয়ে থাক।

হারাণচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—তা কি হয়? ঘরে বসে থাকলে কি আমার চলে? রাজ্যের কাজ আমার মাথার উপর প'ড়ে আছে।

তবে যাও—

সে চলিয়া যাইলে শুভদা বাক্স খুলিল। আর একটি টাকা মাত্র আছে। বিন্দুবাসিনী সেদিন যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই একটি টাকা মাত্র তাহাদের সম্বল; শুভদা বাক্সের একটি নিভৃত কোণে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া মাধবের কাছে আসিয়া বসিল।

মা, কখন বাবা বেদানা আনবেন?

সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল—তথাপি হারাণচন্দ্রের দেখা নাই। মাধব অনেকবার খোঁজ লইল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর কাঁদিতে লাগিল।

শুভদা কাছে আসিয়া বসিল। ললনা অনেক করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল; প্রথমে সে কিছুতেই ভুলিতে চাহে না,—অবশেষে শ্রান্ত মনে, অবসন্ন শরীরে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি ভোর না হইতেই সে আবার উঠিয়া বসিল—মা, আমার ডালিম এনেছে?

শুভদা চক্ষের জল চাপিয়া বলিল, ডালিম তোমাকে খেতে নেই।

কেন?

খেলে অসুখ হবে।

সে উঠিয়া বসিয়াছিল, আবার শুইয়া পড়িল। পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, হারাণচন্দ্র বাটী আসিলেন। রাসমণি রাগ করিয়া একটা কথাও

কহিলেন না। ললনা পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, স্নান করিবার উপকরণ, হুঁকাতে জল ভরিয়া তামাক সাজিয়া দিল। হারাণচন্দ্র স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া আহার করিলে, শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, মাধবের বেদানা এনেচ?

ঐ যা—আহা-হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখেছিলাম, ছেঁড়া পকেটে সমস্ত পয়সা কোথায় প'ড়ে গেছে। থাকে ত আজ গণ্ডা চারেক পয়সা ধার দিও, সন্ধ্যার সময় তোমাকে সমস্ত ফিরিয়ে দেব।

শুভদা ম্লানমুখে বলিল, আর কিছু নেই। হারাণচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তা কি হয়? তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কখনই ফুরোয় না।

শুভদা মনে মনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, সত্যি কিছু নেই।

কেন থাক্‌বে না? কাল যে দেখলাম অনেকগুলো পয়সা আর একটা টাকা আছে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল। হারাণচন্দ্র আবার বলিলেন, ছিঃ! আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না? সমস্ত টাকাটা না দিয়ে বিশ্বাস হয়, আনা চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়!

আর আপত্তি করিল না, শুভদা হাত ধুইয়া প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া দিল।

অর্থের সদ্ব্যবহার বটে। হারাণচন্দ্র হলুদপুর গ্রাম পার হইয়া বামুন-পাড়ায় আসিলেন। তাহার পর একটা গলিপথ ধরিয়া একটা দরমা-ঘেরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে অনেকগুলি প্রাণী জড় হইয়া এক কোণে বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা সাহ্লাদে মহা কলরব করিয়া উঠিল। অনেক প্রীতি সম্ভাষণ হইল ; কেহ বাবা বলিয়া ডাকিল, কেহ দাদা বলিয়া ডাকিল, কেহ খুড়ো, কেহ মামা, কেহ মেসো ইত্যাদি বহু মান্যে বহু সম্ভাষিত হইয়া মুরুব্বির মত হারাণচন্দ্র তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন। অনেক কথা চলিতে লাগিল। অনেক রাজা উজিরের মুণ্ডপাত করা হইল, অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইল। এটা গুলির দোকান। সংসারের এক প্রান্তে শ্মশান, আর অপর প্রান্তে গুলির দোকান। শ্মশানে মহারাজাও ভিক্ষুকের সমান হইয়া যান, এখানেও ভিক্ষুক মহারাজার সমান হইয়া দাঁড়ান। টানে টানে অহিফেন মগজে যত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়ের মহত্ত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি একে একে তেমনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কত দান, কত প্রতিদান! মণি, মুক্তা, হীরক কাঞ্চন, কত রাজ্য, কত রাজকন্যা, টানে টানে অবাধে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। একধারে এত রত্ন, জগতের তাবৎ বাঞ্ছিত বস্তু, অর্দ্ধ আলোকে, অর্দ্ধ আঁধারে, দরমার ঘরে, ভূতলে সে ইন্দ্রসভা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনেকগুলি কালিদাস অনেকগুলি দিল্লীর বাদসাহ, অনেকগুলি নবাব সিরাজদ্দৌলা, অনেকগুলি মিঞা তানসেন একে একে ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। জগতের নীচ লোকের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন না, কথাবার্ত্তা

আলাপ-পরিচয় করা শোভা পায় না, কাজেই তাঁহারা রাস্তার একপাশ ধরিয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব প্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হারাণচন্দ্রও তাঁহাদের মত বাহিরে আসিলেন ; কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার একটু বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে সেই হতভাগ্য পীড়িত মাধবের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেদানার কথাটাও স্মরণ হইল। অপর সকলের মত তিনি অবশ্য কোন একটা বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন কিন্তু মুখপোড়া ছোঁড়ার মুখখানা সে রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া দিল। দিল্লীর বাদশা পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন রাজকোষ প্রায় শূন্য ! অত বড় সম্রাটের চারিটি পয়সা ও একটি গাঁজার কলিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বহুত আচ্ছা ! তাহাই সহায় করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটা গঞ্জিকার দোকানে প্রবেশ করিলেন।

অধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, খুড়ো, চার পয়সার তামাক দাও ত।

অধিকারী সে আজ্ঞা সত্বর সম্পাদন করিল।

হারাণচন্দ্র তখন মনোমত একটা বৃক্ষতল অন্বেষণ করিয়া লইয়া গঞ্জিকা সাহায্যে বিশৃঙ্খল রাজত্ব পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন। সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে রাত্রি অনেক হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অনেক দূর গিয়া একটা খোড়ো বাড়ির সম্মুখের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কাত্যায়নী !

কেহ উত্তর দিল না।

আবার ডাকিলেন, বলি কাতু বাড়ি আছ কি ?

তথাপি উত্তর নাই।

বিরক্ত হইয়া হারাণচন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বলি বাড়ি থাক ত দরজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও না !

একবার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব আসিল, কে ?

আমি—আমি।

আমার বড় শরীর অসুখ—উঠতে পারব না।

তা হবে না। উঠে খুলে দাও।

এবার একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া কাল-কাল মোটা-সোটা সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরা মানানসই যুবতী যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতে করিতে আসিয়া খট্ করিয়া দ্বার মোচন করিল।

উঃ মরি—যে পেটে ব্যথা! অত ষাঁড় চেঁচাচ্চ কেন ?

চেঁচাই কি সাধে ? দোর না খুললেই চেঁচাচেঁচি করতে হয়।

যুবতী বিরক্ত হইল—না বাবু অত আমার সইবে না। আস্তে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই যখন তখন যে অমনি ক'রে চেঁচাবে তা হবে না, অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

হারাণচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গলবদ্ধ করিলেন। তাহার পর কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আহা! পেটে ব্যথা হয়েছে তা ত আমি জানি নে।

তুমি কেমন ক'রে জানবে ? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখন পর্য্যন্ত পেটে একবিন্দু জলও যায় নি। তা এত রাত্তিরে কেন ?

একটু কাজ আছে।

কাজ আবার কি ?

বলচি! তুমি একটু তামাক সাজ দেখি।

রমণী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দিয়া ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া বলিল, ঐ কোণে সব আছে। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও, আমাকে আর জ্বালাতন ক'রো না—আমি একটু শুই।

হারাণচন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, না, না, তোমাকে বলি নি—আমার মনে ছিল না, তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্চি।

তখন তামাকু সাজিয়া হুঁকা হস্তে হারাণচন্দ্র কাত্যায়নীর পার্শ্বে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিবার পর, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, বড় মৃদু—পাছে গলার স্বর কর্কশ শুনায়, কহিলেন, কাতু, আজ আমাকে গোটা দুই টাকা দিতে হবে।

কাত্যায়নী কথা কহিল না।

বলি শুন্‌লে? ঘুমুলে কি? আজ আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।

কাত্যায়নী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল কিন্তু কথা কহিল না। হারাণচন্দ্র একটু সাহস পাইলেন। হুঁকাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, দেবে ত?

কাত্যায়নী কথা কহিল, মিছে ভ্যান্ ভ্যান্ করচ কেন? কোথা থেকে দেব?

কেন, তোমার নেই কি?

না।

আছে বৈকি! বড় দরকার; আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

থাক্‌লে ত দয়া করব।

দুটো টাকা তোমার আছেই। আমি জানি আছে। টাকা অভাবে বাড়িতে আমার খেতে পাচ্চেনা, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচি; লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে। কাতু, আজ আমাকে বাঁচাও—

থাক্‌লে ত বাঁচাব? আমার একটি পয়সাও নেই।

এইবার হারাণচন্দ্রের ক্রোধ হইল; বলিলেন, কেন থাকবে না? এত

টাকা দিলাম আর আমার অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না? চাবিটা দাও দেখি, সিন্দুক খুলে দেখি টাকা আছে কি না।

কাত্যায়নীর আঁতে ঘা লাগিল। একটা অবাচ্য অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্রোধদৃপ্ত লোচনে হারাণের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিল, কেন, তুমি কে যে তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেব? সে ছোট লোকের মেয়ে, নীচ কথা তাহার মুখে বাধে না। অনায়াসে চীৎকার করিয়া বলিল, যখন রেখেছিলে তখন টাকা দিয়েছিলে, তা বলে তোমার দুঃসময়ে কি সে ফিরিয়ে দেব?

হারাণচন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কাত্যায়নীর মুখের সম্মুখে তিনি কখনই দাঁড়াইতে পারেন না; আজও পারিলেন না। নিতান্ত নরম হইয়া বলিলেন, তবু ভালবেসেও ত একটু উপকার করতে হয়?

ছাই ভালবাসা। মুখে আগুন অমন ভালবাসার। আজ তিনমাস থেকে একটি পয়সা দিয়েচ কি যে ভালবাসব?

ছিঃ! অমন কথা বোলো না কাতু, ভালবাসা কি নেই?

এক তিলও না। আমাদের যেখানে পেট ভরে সেইখানে ভালবাসা। এ কি তোমার ঘরের স্ত্রী যে গলায় ছুরি দিলেও ভালবাসতে হবে? তোমা ছাড়া কি আমার গতি নেই? যেখানে টাকা সেইখানে আমার যত্ন, সেইখানে আমার ভালবাসা! যাও বাড়ি যাও—এত রাত্তিরে বিরক্ত ক'র না।

কাতু, সব কি ফুরোলো?

অনেক দিন ফুরিয়েছে। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলি নি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন সমস্ত স্পষ্ট করেই বলি; তোমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ—আমার এখানে আর এসো না। বাবুদের টাকা চুরি ক'রে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরি-বাকরি নেই, কোন দিন আমার কি সর্ব্বনাশ

করে ফেল্‌বে, তার চেয়ে আগে ভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাই হবে। এখানে আর আস্‌ব না। তোমার জন্যে আমার সব হ'ল ; তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্যে আমি স্ত্রীপুত্র দেখি না, শেষে তুমিই—

হারাণচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, আজ আমার চোখ ফুটলো—

এবার কাত্যায়নীও নরম হইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোটলোকের মেয়ে, ছোট-লোক—কিন্তু এটা বুঝি যে আগে স্ত্রীপুত্র বাড়িঘর তারপর আমরা ; আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তার পর সথ, নেশা ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি এখানে আর এসো না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রীপুত্র দেখ গে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।

কাত্যায়নী শয্যা হইতে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া হারাণচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, এই নিয়ে যাও—

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ অধোবদনে নিরুত্তর বসিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার দরকার নেই।

কাত্যায়নী অল্প হাসিল ; হাত দিয়া হারাণের মুখখানা তুলিয়া বলিল, যে কিছু জানে না তার কাছে অভিমান ক'রো—এ না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে, তা জান ?

কেন ?

তোমাদের যে কিছু নেই।

কেমন ক'রে জান্‌লে ?

এইমাত্র তুমি যে নিজেই বল্‌লে—ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচ।

ওঃ—

শুধু তাই নয়। তুমি এত কথা না বল্‌লেও আমি আগে থেকেই সমস্ত জানি। আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব দেখে এসেছি।

কেন ?

প্রথমতঃ মেয়েমানুষের এসব আপনি দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, তারপর সব দেখে শুনে আট-ঘাট না বেঁধে চল্‌লে আমাদের চলে না। তোমরা যত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা তত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠক্‌লে আর একবার উঠ্‌তে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠ্‌তে পারব না ; আমরা না খেতে পেয়ে ম'রে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে, 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন', আমাদের সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিস খুব সাবধানে নিজে না দেখে শুনে চল্‌লে কি আমাদের চলে ? বুঝেছ ?

কাত্যায়নীর বোধ হয় ক্লেশ হইতেছিল ; এসব কথা কহিতে কহিতে সে-মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত ঢাকা দিয়া ফেলিল। হারাণচন্দ্রের মুখখানা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, যা বল্‌লাম সব বুঝেছ ? এই টাকাগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিও—তবুও দুদিন স্বচ্ছন্দে চলবে নিজের কাছে কিছুতেই রেখো না। শুন্‌চ ?

হারাণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

অনেক রাত্রি হ'ল, আজ আর কোথাও যেও না। এইখানেই শুয়ে থাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক 'সদাদাদা' বলিয়া ডাকিত, অর্দ্ধেক লোক 'সদাপাগলা' বলিয়া ডাকিত। এই হলুদপুর গ্রামেই তাহার বাটী। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরাজি ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরাজি শিখিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখান নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? যে দুবিঘা দশ বিঘা জমি আছে তাহাতে পরের চাকুরি করিতে হইবে না, তবে মিছামিছি জাত দিয়া কি হইবে? কেহ বলিত, সে সংস্কৃত ভাষা জানে, কেহ বলিত, জানে না, যাহা হউক এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সে যে পাগল তাহাতে আর মতভেদ নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীকার করে তাহার একটু বাতিকের ছিট আছে। জমি দেখে, রাম-প্রসাদী গান গাহে, মড়া পোড়ায়, এ-বাটী ও-বাটী করে, এমনি করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। দূরসম্পর্কের এক পিসি ভিন্ন সংসারে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই, তাই গ্রামসুদ্ধ লোককে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। সকলেই তাহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাহার সম্পর্কের ডাক, সকল স্থানেই তাহার অবারিত দ্বার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংসারে তাহার কেহ আপনার লোক নাই; বাল্যকালে সদানন্দের পিতা অনেক টাকা পণ দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যদোষে এক বৎসরের মধ্যেই বধূটির মৃত্যু হয়। সেই অবধি, আজ ছয় বৎসর হইল

সদানন্দ একাকী আছে। টাকা জুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হোক আর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই হোক সে আর বিবাহ করে নাই। তাহাদিগকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত; কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে, সে তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিত, অত টাকা পাই কোথায় যে বিবাহ করিব?

আজ অপরাহ্নে আকাশে ভারি মেঘ করিয়াছে। সমস্ত নিশ্চল, নিস্তব্ধ! প্রকৃতি এমনি ভাব ধরিয়া আছে যেন ইচ্ছা করিলে এখনই প্রবল ধারে জল ঢালিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে হয়ত এখনও তিন-চার ঘণ্টা স্থগিত রাখিতে পারে।

পিসি রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন, ও ললন, ঘরে যে এক ফোঁটা খাবার জল নেই। চট্ ক'রে ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয় না মা।

ললনা কলসী কাঁকালে গঙ্গার ঘাটে আসিল। জল লইয়া দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই মেঘ হইতে বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। ললনা হন্ হন্ করিয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। আসিবার পথেই সদানন্দর বাটী; পথের ধারের আটচালা ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে তখন রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিয়া গান থামাইয়া বলিল, ললনা ভিজছ কেন?

ললনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি গান থামালে কেন?

সদানন্দও হাসিল; হাসি-গান তাহার মুখে অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। সুর করিয়া বলিল, গান থামিয়া গেছে, তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে কহিল, সে কথা যাক্, মিছামিছি ভিজো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

ললনা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, দাঁড়িও না ; বাড়ি যাও।

সে কি ?

পিসিমা বাড়ি নাই, বেশি জল এলে যাবে কেমন করে ?

ললনা ভাবিল সে কথাও বটে ; দুই পদ অগ্রসর হইল কিন্তু আবার পিছাইয়া আসিল।

সদানন্দ বলিল, ফিরলে কেন ?

কাল রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল ; জলে ভিজলে অসুখ বাড়তে পারে।

তবে যেও না এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ তখন আপন মনে গান ধরিল।

> কভু তারে পাব না বুঝি, মিছে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছি।
> কত জ্বালায় জ্বলে মরি, তুই কি জান্‌বি পাষাণী মা !
> আমার সোনার তরি ডুব্‌বে এবার—

ললনা কলসী নামাইয়া গান শুনিতেছিল ; মিষ্ট গলায় মিষ্ট গান তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া যাওয়ায় বলিল, একি থামলে যে ?

আর গা'ব না।

কেন ?

আর মনে নাই।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে গাইলে কেন ?

আমি অমনি গেয়ে থাকি। তাহার পর কিছুক্ষণ আকাশ পানে চাহিয়া বলিল, মেঘের উপর পদ্ম ফোটে, তুমি দেখেছ ?

ললনা সহাস্যে বলিল, কই না, তুমি দেখেছ ?

হাঁ দেখেছি।

কবে দেখলে ?

প্রায়ই দেখি। যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

সদানন্দর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া ললনার হাসি আসিল। মুখে কাপড় দিয়া বলিল, তা কি হয় ?

কেন হবে না ? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতেও জলের অভাব নাই, তবে সেখানে ফুটবে না কেন ?

মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে ?

সদানন্দ ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, তাই বটে! সেইজন্যই শুকিয়ে যাচ্ছে।

ললনা আর কিছু কহিল না। সকলেই জানিত সদাপাগলা দিনের মধ্যে অমন অনেক অসম্ভব ও অসংলগ্ন কথা কহিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সদানন্দ আবার কহিল, ললনা, সারদা আর তোমাদের বাটীতে যায় না ?

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বোধ হয় তখনকার মুখ সদানন্দকে দেখাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সদানন্দ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, যায় না ?

না।

কেন ?

তা বলতে পারি না।

সদানন্দ গান ধরিল—

গান থামিল কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বরং আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। ললনা কাঁকে কলসী তুলিয়া লইল। সদানন্দ দেখিয়া বলিল, ওকি যাও কোথা ?

বাড়ী যাই।

এত বৃষ্টিতে গেলে অসুখ করবে যে!

কি করব!

ললনা চলিয়া গেলে আবার গান ধরিল

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হারাণচন্দ্র যখন স্ত্রীর হস্তে পুরোপুরি দশটা টাকা গুণিয়া দিলেন তখন শুভদার মুখের হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না বরং ম্লান হইয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

সেও সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল, শুভদা, তোমার কি মনে হয় এ টাকা আমি চুরি করে এনেছি?

শুভদা আরও মলিন হইয়া গেল। তাহার পাপ অন্তঃকরণে একথা হয়ত একবার উদয় হইয়াছিল কিন্তু তাহা কি বলা যায়? ঈশ্বর না করুন কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা কি লওয়া উচিত? চুরি করা ধন খাইবার পূর্ব্বে সেঁ অনাহারে মরিতে পারে, কিন্তু আর সকলে? প্রাণাধিক পুত্রকন্যারা? শুভদা বুঝিল, একথা আলোচনা করিবার এখন সময় নহে, তাই টাকা দশটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কতক সুখে স্বচ্ছন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিল। হারাণ মুখুয্যেকে এখন আর বড় একটা হলুদপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটী আসিলে রাসমণি যদি জিজ্ঞাসা করে, তুই সমস্ত দিন কোথায় থাকিস্ রে?

হারাণ বলে, আমার কত কাজ; চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াই।

শুভদাও মনে করে তাহাই সম্ভব, কেন না আর সে পয়সা চাহিতে আসে না, কাল শোধ করিয়া দিব বলিয়া আর দুই আনা চারি আনা ধার করিয়া লইয়া যায় না। সে কোথায় থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব, কেন না আমি তাহা জানি। সে সমস্ত দিন অনাহারে অবিশ্রাম চাকরির উমেদারি করিয়া বেড়ায়। কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী কহে, কত আড়তদারের নিকট এমন কি সামান্য দোকানদারদিগের নিকটও খাতাপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করে, কিন্তু কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সে অঞ্চলে অনেকেই তাহাকে চিনিত, সেই জন্য কেহই বিশ্বাস করিয়া রাখিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বাটী ফিরিয়া আসে, শুভদা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোথায় খেলে ?

হারাণচন্দ্র স্ত্রীর কথায় হাসিবার চেষ্টা করে ; বলে, আমার খাবার অভাব কি ? কে আমাকে না জানে ?

শুভদা আর কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার কলসীর জল শুকাইয়া আসিতেছে, টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে ; আর দুই এক দিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শুভদা তাহা স্বামীর নিকটে বলিতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না, শুধু আপন মনে যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়া-চাড়া করে।

আজ তিন দিবস পরে অনেক রাত্রে স্বামীর শ্রান্ত পা দুটি টিপিতে টিপিতে শুভদা মনে মনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তর্কবিতর্ক করিয়া মুখ ফুটিয়া কহিল, আর নেই, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।

হারাণচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া নিতান্ত সাধারণভাবে বলিলেন, দশ টাকা আর কতদিন থাকে।

আর কোন কথা কহিল না। দুজনেই সে রাত্রের মত চুপ করিয়া রহিল। শুভদা ভাবিয়াছিল, কাল কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; কিন্তু পারিল না। বিনা কারণে নিজেই অপরাধী সাজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল, খরচ করিতে করিতে টাকা কেন ফুরাইয়া যায় এজন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইবে। সত্য সত্য তিরস্কৃত হইলে বোধ হয় দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস করিত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সহানুভূতি পাইয়া, আর কথা ফুটিল না।

পরদিন ভোর না হইতেই হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। ললনা যেরূপ গৃহকর্ম্ম করে, করিতে লাগিল; রাসমণি নিয়মিত স্নান করিয়া আসিয়া মাটির শিব গড়িয়া ঘরে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, শুধু শুভদার হাত পা চলে না, ম্লানমুখে এখানে একবার ওখানে একবার করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা আটটা বাজে দেখিয়া ললনা কহিল, মা, তুমি আজ ঘাটে গেলে না? বেলা যে অনেক হ'ল।

এই যাই।

ললনা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল জননী সেইখানে সেই ভাবেই বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মা?

কিছুই না।

তবে অমন করে বসে আছ যে?

কি আর করব?

সে কি? নাবে না? ভাত চড়াবে না?

শুভদা তাহার কাতর চক্ষু দুটি কন্যার মুখের উপর রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ কিছু নেই?

কি নেই?

কিছুই নেই। ঘরে একমুঠো চাল পর্য্যন্ত নেই।

ললনার মুখ শুকাইয়া উঠিল—তবে কি হবে মা? ছেলেরা কি খাবে?

শুভদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, ললনা, একবার তোর বিন্দুপিসির কাছে গেলে হয় না?

কেন মা?

যদি কিছু দেয়।

ললনা চলিয়া গেলে, শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কথা সে আর কখন বলে নাই, এমন করিয়া ভিক্ষা করিতে কন্যাকে আর কখন সে পাঠায় নাই। সেই কথাই তাহার মনে হইতেছিল। লজ্জা করিতেছিল, বুঝি একটু অভিমানও হইয়াছিল। কাহার উপরে? জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত স্বামীর মুখ মনে করিয়া উপর পানে হাত দেখাইয়া বলিত, তাঁর উপরে!

কপালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে শুভদা বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে; এমন সময় ছলনাময়ী একটা বেনে পুতুলের সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে এবং পুঁথির মালায় তাহার হস্তপদ-হীন ধড়খানা বিভূষিত করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা, ভাত দাও।

শুভদা তাহার মুখপানে চাহিল কিন্তু কথা কহিল না।

ছলনা আবার বলিল, বেলা হয়েছে ভাত দাও মা।

তথাপি উত্তর নাই।

এ-হাতের পুতুল ও-হাতে রাখিয়া ছলনা আরো একটু উচ্চ কণ্ঠে কহিল, ভাত বুঝি এখনো হয় নি?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেন হয় নি ? তুমি বুঝি বেলা পর্য্যন্ত শুয়েছিলে ! তাহার পর কি মনে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উনুনে আগুন পর্য্যন্ত এখনো পড়েনি বুঝি ?

শুভদা বাহির হইতে ক্ষুব্ধভাবে কহিল, এইবার দেব।

ছলনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মার মুখখানা দেখিয়া এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কাছে বসিয়া বলিল, মা, এখন পর্য্যন্ত কিছু হয় নি কেন ?

এইবার সব হবে।

মা, তুমি অমন করে আছ কেন ?

এই সময়ে ঘরের ভিতর হইতে পীড়িত মাধব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, ওমা ! শুভদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছলনাময়ীও দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি বস, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি।

তাই যা মা !

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ললনা খিড়কির দ্বার দিয়া ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল ; কিন্তু বিন্দুবাসিনী সেখানে নাই। পূর্ব্ব রাত্রেই সে শ্বশুরবাটী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল, না হইলে শুভদার সহিত নিশ্চয় একবার দেখা করিয়া যাইত।

ম্লান মুখে ললনা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহার কিছুতেই পা চলিতে চাহে না। গাঙ্গুলি বাড়ি যাইবার সময় লজ্জায় তখনও পা চলিতে ছিল না ; কিন্তু শুধু হাতে ফিরিয়া আসিবার সময় আরো লজ্জা করিতে লাগিল। পথের ধারে একটা গাছতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া অন্য পথে গঙ্গার ঘাট পানে চলিল। নিকটে চক্রবর্ত্তীদের বাটী।

বাহিরে আটচালার পার্শ্বে সদানন্দ একটা গো-বৎসকে বহুবিধ সম্বোধন করিয়া আদর করিতেছিল। ললনা সেইখানে প্রবেশ করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সদানন্দ মুখ ফিরিয়া বলিল, ললনা, তুমি যে!

পিসিমা বাড়ি আছেন?

না। এইমাত্র কোথায় গেলেন।

ললনা ইতস্ততঃ করিয়া এক পদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ গোবৎসকে ছাড়িয়া দিয়া ললনার মুখপানে চাহিয়া বলিল, পিসিমার কাছে দরকার আছে কি?

হাঁ।

তিনি ত বাড়ি নেই, আমাকে বললে হয় না?

ললনাও সেই কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লজ্জায় তাহার সমস্ত বদন লাল হইয়া গেল। বাটীতে কিছু খাইবার নাই সেইজন্য আসিয়াছি—ছিঃ ছিঃ! একথা কি বলা যায়? একদিন না খাইলে কি চলে না? কিন্তু আর সবাই? শুভদাও একদিন ঠিক এই কথাই ভাবিয়াছিল, আজ ললনাও তাহাই ভাবিল—তবু মুখ ফুটে না। যে কখন এ অবস্থায় পড়িয়াছে, সেই জানে ইহা বলা কত কঠিন! সেই কেবল বুঝিবে ভদ্রলোকের একথা বলিতে গিয়া বুকের মাঝে কত আন্দোলন, কত ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া যায়! বলিবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া জিহ্বার প্রতি শিরা আপনা আপনি আড়ষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরেই জড়াইয়া যায়! ললনা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না; কিন্তু সদানন্দ যেন বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ দিয়া ভিতরের ছায়া বুঝি কতক অনুমান করিয়া লইল তাই হাসিয়া উঠিয়া ললনার হাত ধরিল। সে পাগল; সকলেই জানিত সদাপাগলার মতি স্থির নাই। এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যাহা অন্যে করিতে পারিত না; অন্যে যাহাতে

সঙ্কোচ করিত, সে হয়ত তাহাতে করিত না ; অন্যকে যাহা মানাইত না তাহাকে হয়ত সেটা মানাইয়া যাইত। তাই স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে ললনার হাত ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ বুঝি ললনার তার সদা-দাদাকে লজ্জা হচ্ছে ? সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করতে হয় ? হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি কথা বলবে না ?

সদানন্দর গলার স্বর, কথার ভাব এক রকমের। হাসিতে হাসিতেও সে অনেক সময় এমন কথা বলিত, যাহা শুনিলে চোখের জল আপনি উছলিয়া উঠে। তথাপি ললনা কথা কহে না। এবার সদানন্দ মুখ তুলিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, কি রে, ললনা ? কিছু হয়েছে কি ?

ললনা মুখ নিচু করিয়া চক্ষু মুছিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমাকে একটা টাকা দাও।

সদানন্দ পূর্ব্বের মত, বরং আরও একটু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, এই কথা ! এটা বুঝি আর সদাদাদাকে বলা যায় না ? কিন্তু টাকা কি হবে ?

তখনও লজ্জা ! ললনা ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জায় আরো একটু রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, বাবা বাড়ি নেই।

সদানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটার পরিবর্ত্তে পাঁচটা টাকা আনিয়া ললনার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হ'লে তাকে লজ্জা করতে হয়। পাগলকে আবার লজ্জা কি ? তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, যখন কিছু প্রয়োজন হবে তখন ক্ষ্যাপা পাগলাটাকে আগে এসে বলো। কেমন বলবে ত ?

ললনা দেখিল তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিল, এত টাকা কি হবে ?

রেখে দিলে পচে যাবে না।

তা হোক, এত টাকায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে দেখিয়া সদানন্দ আবার আসিয়া তাহার হাত ধরিল। কাতরভাবে বলিল, ছিঃ ছেলেমানুষি ক'রো না। টাকার প্রয়োজন না থাকে অন্যদিন ফিরিয়ে দিও। আর একথা কাকেও ব'লো না, তবে নিতান্ত যদি বলতে হয়, ব'লো যে সদাপাগলা টাকায় চার পয়সা হিসাবে সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

দিনমান এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলে আহার করিল কিন্তু শুভদা সেদিন জলস্পর্শও করিল না। রাসমণি অনেক গালাগালি করিলেন, ললনা অনেক পীড়াপীড়ি করিল কিন্তু কিছুই সেদিন তাহার মুখে উঠিল না।

সন্ধ্যার পর হারাণচন্দ্র রুক্ষ মাথায়, একহাঁটু ধূলা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রের কোঁচার একপার্শ্বে সের দুই আন্দাজ চাউল, অপরপার্শ্বে একটু লবণ, দুটো আলু, দুটো পটল, আরো এমন কি কি বাঁধা ছিল। একটা পাত্র আনিয়া সেগুলি খুলিয়া রাখিবার সময় শুভদা কাঁদিয়া ফেলিল। চাউল এক রকম নহে; তাহাতে সরু, মোটা, আতপ, সিদ্ধ সমস্তই মিশ্রিত ছিল। শুভদা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী তাহাদিগের জন্য এইগুলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মাধব বলিল, বড়দিদি, আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারব না।

ললনা সস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কেন ভাই ভাল হবে না? আর দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে।

কত দুদিন কেটে গেল, কই সেরে ত উঠলাম না।

এইবারে সারবে।

আচ্ছা, যদি না ভাল হই?

নিশ্চয় হবে।

যদি না হই?

ললনা তাহার দুর্ব্বল ক্ষীণ হাত দুইটি আপনার হাতে লইয়া অল্প গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

মাধব আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ললনা কহিল, মাধু, কিছু খাবি কি?

মাধব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কিছুক্ষণ পরেই ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। ললনা একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে একটু পাঁচন ঢালিয়া মাধবের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, খাও।

মাধব পূর্ব্বের মত শিরশ্চালন করিল। ঔষধ সে কিছুতেই খাইবে না। সে এরূপ প্রায়ই করিত, তিক্ত ঔষধ বলিয়া কিছুতেই খাইতে চাহিত না, কিন্তু একটু জোর করিলেই খাইয়া ফেলিত।

ললনা বলিল, ছিঃ দুষ্টামি করে না—খাও।

মাধব হস্তে গ্লাস লইয়া সমস্ত ঔষধটা নিচে ফেলিয়া দিল।

মাধব আর কখন এরূপ করে নাই। ললনা বিস্মিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, ও কি মাধু?

আমি ওষুধ আর খাব না।

কেন?

মিছামিছি খাব কেন? যদি ভালই হব না তবে ওষুধ খেয়ে কি হবে?

কে বলেছে ভাল হবে না?

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

ললনা নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, মাধু, আমার কথা শুন্‌বে না?

বালক-সুলভ অভিমানে তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

আমার কথা কেউ শোনে না, আমিও কারো কথা শুনব না।

কে তোমার কথা শুনে না?

কে শোনে? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে মা রাগ করেন, বাবা রাগ করেন, পিসিমা কথা কন না, তুমিও রাগ কর, তবে আমি কেন কথা শুন্‌ব?

মাধবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললনা সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি শুন্‌ব।

তবে বল, আমি ভাল না হলে কি রোজ এমনি করেই শুয়ে থাক্‌ব?

তা কেন?

তবে কি?

ললনার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধব তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বড়দিদি, আমাদের ছোটভাই যাদুর অসুখ হ'য়েছিল, কিন্তু সে ভাল হ'ল না।

তারপর মরে গেল। বাবা কাঁদলেন, মা কাঁদলেন, পিসিমা কাঁদলেন, তুমি কাঁদলে, সবাই কাঁদলে—মা আজো কাঁদেন, কিন্তু সে আর এল না, আমিও যদি তার মত মরে যাই ?

ললনা দুই হস্তে নিজের মুখ আবৃত করিল। অন্য সময় হইলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত, কিন্তু এখন পারিল না। মাধবও কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর পুনর্ব্বার কহিল, বল না বড়দিদি মরে গেলে কি হবে ?

ললনা মুখ আবৃত করিয়া কহিল, কিছু না—শুধু আমরা কাঁদ্‌ব। বুঝি সে তখনই কাঁদিতেছিল।

মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল কি না জানি না কিন্তু সে আজ আর ছাড়িবে না; অনেক দিন হইতে যে কথার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা আজ সমস্ত জানিয়া লইবে। তাই পুনর্ব্বার বলিল, দিদি, মরে গিয়ে কোথায় যেতে হয়।

ললনা উপর পানে চাহিয়া বলিল, ঐখানে—আকাশের উপরে।

আকাশের উপরে ? বালক বড় বিস্মিত হইল; কিন্তু সেখানে কার কাছে থাক্‌ব ?

ললনা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাছে।

মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। হাসিয়া বলিল, তবে ভাল। আচ্ছা আমাদের সেখানে বাড়ি আছে ?

আছে।

তবে আরো ভাল। আমরা দুজনে সেখানে বেশ থাকব, না ?

হাঁ। ললনা মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন তাহাই হয়।

মাধব হাত দিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া বলিল, বড়দিদি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায়—না ?

যায়।

অনেক ডালিম আছে?

আছে।

বালক এক গাল হাসিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। যেন এত আনন্দ সে একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবে না; কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, দিদি, কবে যাওয়া হবে?

মাধু!

কি দিদি?

মাকে ছেড়ে তুই কেমন ক'রে যাবি?

কেন, মাও ত যাবে!

যদি না যায়?

আমি ডেকে নিয়ে যাব।

তাতেও যদি না যায়?

এইবার মাধব বড় বিষণ্ণ হইল। দিদি, মা কি কখন যাবে না?

যাবে, কিন্তু অনেক দিন পরে।

তা হোক্—আমরা আগে যাব; তার পর না হয় মা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে হয় না?

না। একথা মাকে বল্‌লে, তিনিও যাবেন না—আমাকেও যেতে দেবেন না।

মাধব ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে বল্‌ব না। তুমি আমাকে ওষুধ দিয়ে খাও গে যাও। আমি শুয়ে থাকি।

ঔষধ খাইয়া বাতাসা খাইয়া জল খাইয়া মাধবচন্দ্র মনের সুখে আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। সেখানে কত কি করিবে; কত ঘুরিয়া বেড়াইবে, কত ডালিম খাইবে, দুই-চারিটা জননীর নিকটে নিচে ফেলিয়া

দিবে, ভাল ভাল পাকা ডালিম নিজে খাইয়া খোসাগুলা ছলনাদিদির গায়ে ছুড়িয়া মারিবে, একটি দানাও তাহাতে রাখিবে না, ছলনাদিদি খুব চাহিবে, অনেক চাহিবে—তবে দুটো একটা ফেলিয়া দিবে ; আরো কত কি শত সহস্র কর্ম্মের তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিতে করিতে মাধবচন্দ্র সে রাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

আর ললনা ? সেও সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইল। পিসিমা রাসমণি, জননী শুভদা, ছলনা, হারাণচন্দ্র সকলেই ডাকাডাকি করিল কিন্তু কিছুতেই সে উপরের দ্বার খুলিল না।

বড় মাথা ধরিয়াছে—আমাকে ডাকিও না—আমি কিছুতেই উঠিতে পারিব না।

পরদিন হইতে মাধবচন্দ্র একটু অন্যরকম হইয়াছে। সে একে শান্ত তাহার উপর আরো শান্ত হইয়াছে। ঔষধ খাইতে আর আদৌ আপত্তি করে না—এটা খাব না, ওটা দাও, ও খাব না, তা দাও, এরূপ একবারো বাহানা করে না। আজকাল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। মা যদি কখন জিজ্ঞাসা করেন, মাধু কিছু খাবি কি ? সে বলে, দাও।

কি দেব ?

যা হয় দাও।

বড়দিদি কাছে বসিয়া থাকিলে ত আর কথাই নাই। দুজনে চুপি চুপি অনেক কথা কহে, বিস্তর পরামর্শ করে ; কিন্তু কেহ আসিয়া পড়িলেই চুপ করিয়া যায়।

এখন হইতে হারাণের সংসারে আর তেমন ক্লেশ নাই। যখন বড় কিছু হয় তখনই ললনা দুটো একটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। শুভদা জানে কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, রাসমণি ভাবে, হারাণ কোথা হইতে লইয়া আসে, হারাণ ভাবে, মন্দ কি ! যখন কোথা হইতে

আসিতেছে, তখন কোথা হইতেই আসুক। আমিই বা কোথা হইতে আনিব? তবে একটা কথা তাঁহার আজকাল প্রায়ই মনে হইতেছে, সে কথাটা আফিমের মৌতাত সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, অভ্যাসটা বুঝি একেবারেই ছাড়িয়া যাইতেছে। আর ছাড়িলেই বা উপায় কি? বাহাল রাখিবার মত আফিম বা কোথা হইতে যোগাইবে? যেমন করিয়া হউক আর যাহা করিয়াই হউক পেট ভরিয়া যখন চারিটা খাইতে পাইতেছি তখন ওজন্য আর মন খারাপ করিব না; সময় ভাল হইলে আবার হইবে, এখন যেমন আছি তেমনিই থাকি।

দিনকতক পরে সদানন্দর পিসিমাতা একদিন ধরিয়া বসিলেন, বাবা, আমাকে একবার কাশী দেখিয়ে নিয়ে এস; কবে মরব কিছুই জানা নাই, অন্ততঃ এজন্মে একবার কাশী বিশ্বেশ্বর দেখে নিই।

সদানন্দ কিছুতেই আপত্তি করে না, ইহাতেও করিল না। দুই-একদিন পরে কাশী যাইবে স্থির করিল। যাইবার দিন সন্ধ্যাবেলা 'ললনা ললনা,' ডাকিতে ডাকিতে সে একবারে উপরে আসিয়া উঠিল। ললনা তখন উপরেই ছিল, সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ কোঁচার কাপড়ে করিয়া গোটা পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি খুলিয়া একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়া রাখিয়া বলিল, আমরা আজ কাশী যাব। কবে ফিরব বলতে পারি না; যদি প্রয়োজন হয় এগুলি খরচ ক'রো।

ললনা বিস্মিত হইয়া উঠিল—এত টাকা?

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও হাসিয়া উঠিল—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা বেশি টাকা নয়! দেখতে অনেকগুলি বটে কিন্তু খরচের সময় খরচ করতে অনেক নয়।

কিন্তু এত—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সদানন্দ কি একরূপ হস্তভঙ্গি করিয়া একেবারে নিচে আসিয়া রন্ধনশালায় শুভদার নিকট আসিয়া বসিল।

খুড়িমা, আজ আমরা কাশী যাব।

শুভদা সে কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, কবে আসবে?

তা কেমন ক'রে বলব? তবে পিসিমার কাশী দেখা হ'লেই ফিরে আসব বোধ হয়।

শুভদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাই এসো বাবা। আশীর্ব্বাদ করি নিরাপদে থেকো।

সদানন্দ উচ্চ হাসিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন ললনা অর্দ্ধেকগুলি টাকা নিজের নিকট রাখিয়া অপর অর্দ্ধেক মাতৃসকাশে ধরিয়া দিয়া বলিল, মা, যাবার সময় সদাদাদা এই টাকাগুলি দিয়ে গেছেন।

শুভদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেগুলি গুণিতে লাগিলেন। গণনা শেষ করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, সদানন্দ আর জন্মে বোধ হয় আমাদের কেউ ছিল।

ললনা মাথা নাড়িয়া বলিল, বোধ হয়।

এত টাকা কি মানুষে দিতে পারে?

ললনা উত্তর দিল না।

ললনা, সদানন্দ কি পাগল?

কেন?

তবে এমন করে কেন?

দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হওয়া কি পাগলের কাজ?

তবে লোকে পাগল বলে কেন?

ললনা সহাস্যে বলিল, লোকে অমন ব'লে থাকে।

হারাণ মুখুয্যের সংসারে আজকাল কষ্ট নাই বলিলেই হয়। খাওয়া পরা বেশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাড়ার পাঁচ জনে পাচ কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, হারাণে বেটা নন্দীদের ঢের টাকা মারিয়াছে, কেহ বলিল, বেটা আজকাল একটা বড়লোক। কেহ বলিল, কিছুই নাই—বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। এমনি অনেক কথা হইত। যাহারা পর তাহারা একটু কম কৌতূহলী হইয়া রহিল, যাহারা একটু আত্মীয় তাহারা অধিক কৌতূহলী হইয়া মুখোপাধ্যায় পরিবার সম্বন্ধে অল্প বিস্তর ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণঠাকুরাণী সহসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বলি বৌয়ের কি হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া চুকল কি?

শুভদা বলিল, হাঁ, এইমাত্র।

তখন কৃষ্ণঠাকুরাণী পানের সহিত তামাকপত্র চর্ব্বণ করিতে করিতে এবং পিক্ ফেলিতে ফেলিতে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন, বৌ, হারাণ আজকাল কচ্চে কি?

কি আর করবেন—চাকরি-বাকরির চেষ্টা কচ্চেন।

সংসার চল্‌চে কেমন ক'রে?

শুভদা উত্তর করিল না।

কৃষ্ণঠাকুরাণী আবার বলিলেন, লোকে বলে হারাণ মুখুয্যে নন্দীদের ঢের টাকা মেরেচে; সে আজকাল বড়লোক—তার খাবার ভাবনা কি? কিন্তু আমি ত সব কথা জানি, তাই বলি সংসার এখন চলে কেমন ক'রে?

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অমনি একরকম ক'রে।

হারামজাদা মাগী বামুনপাড়ার কাতি সেই ত এই দুর্ঘটনা ঘটালে; ইচ্ছে করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি।

শুভদা একথা কানে না তুলিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার খাওয়া হয়েছে ?

হাঁ বোন হয়েছে। সেই হারামজাদীই ত এই সর্ব্বনাশ ঘটালে। হারাণ মুখ্যু কিনা তাই তার ফাঁদে পা দিলে। তিন হাজার টাকা চুরি করলি, না হয় দুশ-একশ মাগের হাতেই এনে দিতিস! তবু ত কিছু থাকত।

শুভদা বলিল, ঠাকুরঝি, আজ কি রাঁধলে ?

কি আর রাঁধব বোন ? আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল তাই ভাতে-ভাত ছাড়া আর কিছুই করি নি। তা মাগীর কি ছাই একটু পরকালের ভাবনাও আছে ? মিন্সে দুটো টাকার জন্যে যখন হাতে পায়ে ধরলে তখন কি না ঘর থেকে বের ক'রে দিলে ; কিন্তু ভগবান কি নেই ? বামুনের যেমন সর্ব্বনাশ করেছে, তোর মতন সতীলক্ষ্মীর যখন চোখের জল ফেলেচে তখন শাস্তি কি হবে না ? তুই দেখিস, আমি বল্‌লাম—

শুভদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, বিন্দু অমন হঠাৎ শ্বশুর-বাড়ি চলে গেল কেন ?

ওর শ্বশুরের নাকি রাতারাতি কলেরা হয়েছিল। তা তুই এখন সংসারের কি রকম বন্দোবস্ত করবি ?

আমি আর কি করব ? ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে। কৃষ্ণঠাকুরাণী একটু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই ; কিন্তু ভাবনার ওপর ভাবনা হচ্চে এই তোর ছোট মেয়েটা। ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল— এখন তার বিয়ে না দিলে ভালও দেখাবে না বটে, আর লোকেও পাঁচ কথা বলবে। তার কিছু উপায় হচ্চে ?

শুভদা যখন ম্লানমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল তখন ললনা সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছলনার কথা সে কতক শুনিতে পাইয়াছিল,

এবং কতক অনুমান করিয়া লইয়া বেশ বুঝিল যে সুসময়ই হৌক আর অসময়ই হৌক, বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিলে চলিবে না; সম্ভবতঃ জাতি যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথী তীরের অর্দ্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য পথ চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছেন।

যুবকের নাম সারদাচরণ রায়। হলুদপুব গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া কতদূর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ তাহা বলিতে পারি। বৃদ্ধ পিতার সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম নিজেই নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সারদাচরণের জননী জীবিত নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন হারাণ মুখুয্যেদের বাটীর সহিত ইহাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল; রাসমণি ও সারদার জননী উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এখন তিনিও গত হইয়াছেন, আত্মীয়তা বন্ধুত্বও গত হইয়াছে। বিশেষ সারদাচরণের পিতা রামমোহন-বাবু দরিদ্রের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না।

এইখানে একটু ললনার কথা বলিয়া রাখি; কেন না তাহার সহিত এ আখ্যায়িকায় আমাদিগের অনেক প্রয়োজন আছে। বালিকা-কাল হইতেই সারদার সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার পর তাহার বিবাহ হয়। হারাণবাবুর অবস্থা তখন মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব ঘটা করিয়া বড়মেয়ের বিবাহ দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যে ললনা দুই

বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইয়া বাটী ফিরিয়া আসে। তখনও সারদাচরণের সহিত তাহার ভাব ছিল। সে ভাব কমিল না বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দুইজনেরই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; ক্রমে দুইজনেই বুঝিতে লাগিল যে, এ প্রণয় পরিণামে বড় সুখের হইবে না। সারদাচরণ না বুঝুক কিন্তু ললনা একথা বেশ বুঝিতে লাগিল। ক্রমশঃ ললনা ভালবাসার দোকান-পাট একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে আর কাছে আসে না, আর আসিতে বলে না, আর ভালবাসা জানায় না, আর গোপনে তেমন করিয়া পত্র লিখে না—দেখিয়া শুনিয়া সারদাচরণ বড় বিপদে পড়িল। প্রথমে সে অনেক বুঝাইল, অনেক আপত্তি করিল, অনেক যুক্তি দেখাইল কিন্তু ললনা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া রহিল। একদিন সে একরূপ স্পষ্টই কহিল, তার এসব ভাল লাগে না।

সারদাচরণও সে দিবস কুপিত হইল, বলিল, যদি ভাল লাগে না তবে এতদিন লাগল কেন ?

এতদিন ছেলেমানুষ ছিলাম। এখন বড় হয়েছি।

বড় হ'লে বুঝি আর ভাল লাগতে নাই ?

না।

কিন্তু বুঝে দেখ—

কথা শেষ না হইতেই ললনা বলিয়া উঠিল, আর বুঝে কাজ নাই। তুমি আমাকে আর কুপরামর্শ দিও না।

সারদাচরণ চটিয়া উঠিয়া বলিল, আমি বুঝি তোমাকে কুপরামর্শ দিই ?

দাওনা ত কি !

দিই ?

দাও।

তবে এস আজ সব শেষ করে দিই।

ভালই ত।

তোমার সঙ্গে এ-জন্মে আমি আর কথা ক'ব না।

কয়ো না।

তখন দুইজনে দুইজনের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। সমস্ত পথটা সারদাচরণ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে গেল, সমস্ত পথটা ললনা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিল।

সে আজ চারি বৎসরের কথা। চারি বৎসর পরে সারদাচরণ আবার ললনার পথ চাহিয়া ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া রহিল। সে পূর্ব্বের কথা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ যাইতেছিল কিন্তু ললনাই পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়া তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে; তাই পূর্ব্বের কথা পুনরায় একটির পর একটি করিয়া তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইতে লাগিল। কেহ বলে, বাল্য-প্রেমে অভিসম্পাত আছে, কেহ বলে, বাল্য-প্রেম দৃঢ় হয় না, কেহ বলে, দৃঢ় হয়; যাহাই হৌক এ বিষয়ে ঠিকঠাক একটা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা নাই। সকল রকমই হইতে পারে; কিন্তু যাহাই হৌক ইহার একটা স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভিতরে রহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হৌক না কেন, একটু ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।

সারদাচরণের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। আজ চারি বৎসর পরে সে আবার আসিবে, কাছে বসিবে, কথা কহিবে! সারদার ভিতরটা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে যেন অল্প রোমাঞ্চ হইল; কিন্তু কেন? কেন আসিবে? কেন আমাকে এ-সময়ে এ-স্থানে আসিতে অনুরোধ করিল! আর কি সম্বন্ধ আছে?

রাত্রি প্রায় একটা বাজে! একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া

সেই পথে আসিতে লাগিল। সারদাচরণ ভাবিল, একি ললনা? ললনাই ত বটে? কিন্তু বড় হইয়াছে।

ললনা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সারদাচরণ সঙ্কোচ ছাড়িয়া বলিল, বস।

তখন বহুদিনের পর দুইজনে মুখোমুখি হইয়া চাঁদের আলোকে ভগ্ন মন্দিরে সেই চাতালের উপর উপবেশন করিল। বহুক্ষণ অবধি কেহ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর সারদাচরণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন?

ললনা মুখ তুলিয়া বলিল, আমার প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলছি।

পুনরায় বহুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইলে সারদাচরণ বলিল, কই বললে না?

বলছি। পূর্ব্বে তুমি আমাকে ভালবাসতে, এখন আর বাস কি?

প্রশ্নের ভাবে সারদাচরণ বড় বিস্মিত হইল। কহিল, সে কথা কেন?

কাজ আছে।

যদি বলি এখনো ভালবাসি?

ললনা মৃদু হাসিয়া সলজ্জে বলিল, আমাকে বিবাহ করবে?

সারদাচরণ একটু পিছাইয়া বসিল। বলিল, না।

কেন করবে না?

তোমাকে বিবাহ করলে জাত যাবে।

গেলেই বা।

খাব কি?

খাবার ভাবনা তোমাকে করতে হবে না।

কিন্তু পিতার মত হবে না।

হবে। তুমি তাঁর ত একটিমাত্র সন্তান; ইচ্ছা করলে মত করে নিতে পারবে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সারদাচরণ বলিল, তবুও হয় না।

কেন?

অনেক কারণ আছে! প্রথমতঃ পিতার মত হলেও, তোমাকে বিবাহ করলেই জাত যাবে। জাত খুইয়ে হলুদপুরে তিষ্ঠান আমাদের সুখের হবে না; আর আমার এমন অর্থও নাই যে তোমাকে নিয়ে বিদেশে গিয়ে থাকতে পারি। দ্বিতীয়তঃ যা ফুরিয়ে গিয়েছে তা ফুরিয়েই যাক্, এ আমার ইচ্ছাও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তবে তাই হোক; কিন্তু আমার একটি উপকার করবে?

বল; সাধ্য থাকে ত করব।

তোমার সাধ্য আছে, কিন্তু করবে কি না বলতে পারি না।

বল; সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখব।

আমার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ কর।

সারদাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন তার কি পাত্র জুটছে না?

কৈ জুটছে? আমরা দরিদ্র; দরিদ্রের ঘরে কে সহজে বিবাহ করবে? শুধু তাই নয়। আমরা কুলীন; অঘরে বিবাহ দিলে হয়ত বর জুটতে পারে কিন্তু তা হ'লে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তোমরা আমাদের পালটি ঘর; তুমি বিবাহ করলে সব দিকেই রক্ষা হয়। বিবাহ করবে?

আমি পিতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। তাঁর মত না নিয়ে কোন কথাই বলতে পারব না।

তবে মত নিয়ে বিবাহ কর।

আমি যতদূর জানি, এ বিবাহে তাঁর মত হবে না।

ললনা ম্লানভাবে কহিল, কেন মত হবে না ?

তবে তোমাকে বুঝিয়ে বলি। লুকিয়ে কোন ফল নাই। আমার পিতা কিছু অর্থ-পিপাসু; তাঁর ইচ্ছা যে আমার বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থ লাভ করেন। তোমরা' অবশ্য কিছুই দিতে পারবে না, তখন বিবাহ হবে না।

ললনা কাতর হইয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, কোথায় কি পাব ? আর তোমাদের অর্থের প্রয়োজন কি ? যথেষ্ট ত আছে।

সারদাচরণ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, সে কথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝবেন না।

তুমি বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় বুঝবেন।

আমি একবার মাত্র বলব। বুঝিয়ে বলতে পারব না!

ললনা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে কেমন করে হবে ?

আমি কি করব ?

তোমার বোধ হয় বিবাহ করতে ইচ্ছা নাই।

ছলনার মত কন্যা তুমি সহজে পাবে না। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্ম্মিষ্ঠা, অধিকন্তু একজন দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার করা হবে, একজন ব্রাহ্মণের জাত কুল রক্ষা করা হবে এবং আমি চিরদিন তোমার কেনা হয়ে থাকব; বল এ বিবাহ তুমি করবে ?

পিতা যা বলবেন তাই করব।

আজ তোমাকে সকল কথা বলি। হয়ত এজন্মে আর কখন বলবার অবসর পাব না, তাই বলি—তোমাকে লজ্জা কখন করি নাই, আজও

করব না। সমস্ত কথা খুলে বলে যাই—তোমাকে চিরদিন ভাল-বেসে এসেছি, এখনো ভালবাসি। একথা পূর্ব্বে একবার বলেছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষ বললাম। তুমি আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধ হয় এই শেষ অনুরোধ—রাখলে না। যা হবার হ'ল আর এমন কখনো হবে না। মিথ্যা তোমাকে এত ক্লেশ দিলাম, সে জন্য ক্ষমা করো।

সারদাচরণ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ললনা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিল, পিতাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করব।

ললনা না ফিরিয়াই বলিল, করো।

কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞাধীন।

ললনা চলিতে চলিতে বলিল, তা ত শুনলাম।

যদি কিছু করতে পারি তোমাকে জানাব।

ভাল।

ললনা, আমাকে ক্ষমা করো—

করেছি।

দশম পরিচ্ছেদ

আমার নক্সা—দাও বাবা চার আনা পয়সা। 'গাড্ডিলে'র হাত হইতে চারি আনা তাম্রখণ্ড গুণিয়া লইয়া হারাণচন্দ্র কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া রাখিলেন। যা থাকে কপালে—ধরলাম আট আনা। আট আনা পয়সা হারাণচন্দ্র সম্মুখে শতছিন্ন চাটায়ের উপর ঠুকিয়া রাখিয়া তাস হাতে লইলেন। সঙ্গীরা সকলেই উৎকণ্ঠিত ভাবে স্ব স্ব তাস দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাত দুই-তিন লাফাইয়া উঠিয়া

বলিলেন, ফের নক্সা—দাও ত চাঁদ টাকা! 'গাড্ডিল' হারাণচন্দ্রকে টাকা দিয়া তাহার সম্মুখে তাস জোড়া নিক্ষেপ করিল। অপরাপর সকলে একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া স্ব স্ব তহবিল হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

আর চাই—আর চাই—আর চাই?

বস্ কর—আর না।

পনরতে চেপে যাও।

পচে যা—পচে যা বাবা—এই আমার নক্সা।

প্রায় নিশাবসানে হারাণচন্দ্র যখন স্থান পরিত্যাগ করিলেন তখন কোঁচার টিপ টাকা পয়সায় রীতিমত ভারী। সে রাত্রে তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। পরদিনও এ-দোকান সে-দোকান করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বেলা চারিটার সময় যখন তিনি বাটীতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অসম্ভব রক্তবর্ণ; মুখ, নাক, কাপড়, চাদর সর্ব্বাঙ্গ হইতে গঞ্জিকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। হারাণচন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলে শুভদা সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, আজ বড় বেলা হয়েছে।

কি করি, বল, কাজের গতিকে বেলা হ'য়ে যায়। তুমি এখনো কি খাও নি?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, খাও নি?

এইবার খাব!

হারাণচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এ সব তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই; যদি সমস্ত দিন না আসি তা হলে কি সমস্ত দিন উপবাসী থাকবে?

দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া হারাণচন্দ্র শুভদার পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল সকাল বেলা তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, না ?

শুভদা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কই না।

চাও নি ? আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কাল না চেয়ে থাক, দুদিন পরে ত চাইতেই হবে—সে একই কথা। আমার ঐ চাদরের খুঁটে গোটা-আষ্টেক টাকা বাঁধা আছে, তা থেকে গোটা পাঁচেক তুমি নিও।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সে আজ বড় বিস্মিত হইল, বহুদিন হইতে এরূপ কখন হয় নাই ; বহুদিন হইল তিনি এরূপ স্বইচ্ছায় শুভদার হাতে টাকা দিতে আসেন নাই। আহারাদি শেষ হইলে শুভদা বলিল, টাকা পেলে কোথায় ?

আজ হারাণচন্দ্রের মুখ ফুটিয়া হাসি বাহির হইল। বলিলেন, ওগো আমাদের টাকার জন্য ভাব্‌তে হয় না। পুরুষমানুষের পেটে যদি বুদ্ধি থাকে ত তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটা টাকা ছড়ান থাকে। বুঝেছ ?

শুভদা কি বুঝিল সেই জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুইমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় শুভদা ললনার কাছে বসিয়া নিতান্ত মলিন হইয়া বলিল, ললনা, মা, আজ কি কিছু নেই ?

কিছুই নেই মা।

কতদিন ও কথা তুই বলেচিস, কিন্তু তার পরেই দুআনা চার আনা বের করে দিয়েচিস, দেখ মা, যদি কিছু থাকে, না হ'লে আজ রাতে জল বিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

জননীর কাতর মুখ ও অশ্রুজড়িত গদগদ স্বর শুনিয়া ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই নেই মা। তোমার পা ছুঁয়ে বলচি কিছু নেই।

তখন দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যাকে অনেকটা অবিশ্বাস করার মত হইয়াছে বলিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন কিন্তু ললনার অশ্রু অন্য কারণে বহিতে লাগিল। সে কিছু নাই বলিয়াও ইহার পূর্ব্বে দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তবিকই কিছু দিতে পারিল না। সদানন্দ প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রার শেষ বিন্দুটি আজ প্রাতঃকালে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে! সকলে কি খাইবে; কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে; না খাইতে দিতে পারিয়া জননীর মন কেমন হইবে; প্রাতঃকালে আবার কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে, এই সব ভাবিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। বিন্দু ছিল সে এখন নাই, সদানন্দ ছিল সেও এখানে নাই। শুধু কি তাই? আজ দুই দিন হইতে হারাণচন্দ্রেরও দেখা নাই। সম্ভবতঃ গুলির দোকানে না হয় জুয়ার আড্ডায়!

এখানে একটু হারাণচন্দ্রের কথা বলি, তিনি গাঁজা টিপিতেন, গুলি খাইতেন, ছয় পয়সা চারি পয়সা কর্জ্জ করিতেন, দুই আনা চারি আনা শুভদার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া আদায় করিতেন, নিতান্ত দায়ে পড়িলে ফোঁটা কাটিয়া গাময় ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানের শেষ বৃত্তি —ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন কিন্তু জুয়ার ধর্ম্ম বিশেষ অবগত ছিলেন না। এখন এইটি হইয়াছে। জুয়া খেলার প্রথম অংশে যেরূপ হয় অর্থাৎ দুই চারি পয়সা পাওয়া যায়, দুই চারি টাকা লাভ হয়— তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে কিছু কিছু পাইয়াছিলেন কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল অদৃষ্টও তেমনি গুটাইয়া আসিতে লাগিল। শুভদাকে সেই পাঁচ টাকা দেওয়াই তাঁহার শেষ দেওয়া হইল। তাহার পর যে একেবারে কিছুই পান নাই তাহা নহে। কখন কিছু কিছু

পাইয়াছিলেন কিন্তু তখন আয় অপেক্ষা ব্যয় ভাগটাই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে তিনি হলুদপুরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। এখন আবার বামুনপাড়ায় তিষ্ঠানও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথিমধ্যে যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় সেই কিছু না কিছুর জন্য দাবী করিয়া বসে। দুই পয়সা চারি পয়সা, দুই আনা চারি আনা এমন প্রত্যেক পরিচিত লোকের নিকটই তাঁহার 'কাল দিব' বলিয়া কর্জ্জ করা আছে; প্রতি দোকানদারের তাঁহার নিকট চারি আনা আট আনা পাওনা আছে। এই সকল কারণে বামুনপাড়ায় তাঁহাকে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে সন্ধ্যার সময় গুলির দোকানটা অনুসন্ধান করিলে এক পার্শ্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে; একটু অধিক রাত্রি হইলে জুয়ার আড্ডাঘরের ঝাঁপ খুলিয়া প্রবেশ করিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অধিক রাত্রিই তাঁহার এইখানে অতিবাহিত হয়। পয়সা নাই বলিয়া নিজে খেলিতে পারেন না কিন্তু পরের খেলায় বাজী মারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি পয়সা লাভ করেন। খেলিতে বসিয়া কেহ উঠিতে চাহে না, হারাণচন্দ্র সে সময়ে তামাক সাজিয়া সরবরাহ করেন, বিজেতার পক্ষ টানিয়া দুটো কথা কহিয়া, দুটো রসিকতা করিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া দুবার দুর্গানাম জপ করিয়া, জয়ী পক্ষের মন রাখিয়া মৌতাতের জোগাড়টা করিয়া লন; যেদিন কিছু অধিক আদায় হয় সেদিন নিজেই দুহাত খেলিতে বসেন। হয় কিছু পান, না হয় লাভের অংশ পিপীলিকায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দুই চারি আনা হাতে হইলে সেদিন আর তাঁহাকে পায় কে! গুলির দোকানে আসিয়া সাবেকি চালে মুরুব্বির আসন গ্রহণ করেন; অনেককে রাজা উজির প্রভৃতি উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া শুভদার মুখখানা মনে করিতে করিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অন্ন আছেই।

শুভদার জমিদারী কখন ফুরাইবে না; তাঁহার মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা শুভদা কখন রিক্তহস্ত হইবে না। কাহারো না থাকুক, তাঁহার একমুঠা অন্ন আছেই; কিন্তু বাটী আসিবার সময় তাঁহার একটু মুস্কিল হয়; যেন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পা যেন আর তেমন করিয়া চলিতে চাহে না। অবশেষে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাকে আরও একটু বিব্রত বোধ করিতে হয়। শুভদা যেরূপভাবে পা ধুইবার জল লইয়া আসে; যেরূপভাবে পা মুছাইয়া দিতে আসে; যেরূপ শুষ্কমুখে ভাতের থালাটি সম্মুখে ধরিয়া মৌন হইয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে বসিয়া থাকে তাহাতে হারাণচন্দ্রের মনটাও কেমন কেমন করিতে থাকে, ভাতের গ্রাসগুলো তেমন স্বচ্ছন্দে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। বেলা পাঁচটাই হোক আর রাত্রি তিনটাই হোক—হারাণচন্দ্র দেখিতে পায় শুভদা একইভাবে না খাইয়া না বিশ্রাম করিয়া তাহার ভাতের থালাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। একবার বলে না, কেন এত বেলা হইল, একবার জিজ্ঞাসা করে না, এত রাত্রি করিলে কেন? তাহার বিরস মৌন মুখখানাই তাহাকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে; সে বুঝিতে পারে সে স্বামী হইলেও, এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তির উপযুক্ত নহে, তাই এত যত্ন এত আদর সে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সে দেখিতে পায়, একজন ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আসিতেছে, আর একজন ক্রমাগত ক্ষমা করিয়া যাইতেছে, তাই গুলিখোর গাঁজাখোর হইলেও তাহার চক্ষুলজ্জা করে। শুভদা একবার তিরস্কার করে না, একবার রাগ করে না, একবার ভাবভঙ্গিতেও প্রকাশ করে না যে তুমি অমন করিও না, অমন করিলে আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। হারাণচন্দ্রের বোধ হয় যেন তাহার নিজের বিচার তাহাকে নিত্য নিত্য নিজেই করিতে হইতেছে। নিত্য নিত্য এমন

করিয়া অবিচার করিতে যেন মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বোধ হয়। যাহা হোক এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

অগু অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আজ তাঁহার একটু অন্যরূপ ঠেকিল। আজ শুভদা পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া আসিল না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া কেহ বসিয়া নাই। এককোণে একটা প্রদীপ অতি ম্লানভাবে টিপ টিপ করিতেছে। দীপালোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া হারাণচন্দ্র দেখিলেন তাহাতে তৈল পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার ভয় হইল; আজ দুইদিন তিনি বাটী আসেন নাই, বুঝিবা ইহার মধ্যে কিছু হইয়া গিয়াছে। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া হারাণচন্দ্র নিজের মনে কি সব ভাবিতে লাগিলেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হারাণচন্দ্র কি ভাবিয়া চোরের ন্যায় শতছিন্ন পাদুকাটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

অলক্ষিতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা হইল না। চাতালের উপর ছলনাময়ী বসিয়াছিল। অত ভোরে সে কখন গাত্রোত্থান করে না কিন্তু আজ কি জানি কেন উঠিয়া বাহিরে বসিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কখন এলে?

হারাণচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন, কাল রাতে।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি আক্কেল বল ত? কাল মা, পিসিমা, বড়-দিদি কেউ একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খেতে পায় নি আর তুমি চুপি চুপি জুতো হাতে ক'রে পালিয়ে যাচ্চ? আজ আমরা কি খাব বল ত?

হারাণচন্দ্রের বোধ হইল ছলনাময়ী যেন তাহার মাথাটা কাটিয়া

লইয়াছে। হাতের জুতা আপনা আপনি খসিয়া নিচে পড়িয়া গেল; থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, সত্যি তাই কি?

ছলনা আরো চিৎকার করিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, শুনচ বাবার কথা? আমি যেন মিথ্যে কথা বলচিঁ? কাল সমস্ত রাত মা আর বড়দিদি কেঁদেচে—তুমি তা কেমন ক'রে জানবে বল? শুধু খেতে আসবে বৈ ত আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

হারাণচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, জুতা জোড়াটি হাতে তুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ছলনা আর একবার চিৎকার করিয়া উঠিল, ওগো বাবা পালিয়ে গেল।

ছলনা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাহার উপর বিষম দুর্মুখ। কাহাকে কি বলিতে হয়, কখন কি বলিতে হয়, সে কখন শিখে নাই। ললনা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে ছলনার সম্মুখে আসিয়া বলিল, ছলনা! তোমার একটুও কি বুদ্ধি নেই?

কেন?

কাকে কি বলতে হয় এখনো কি শেখ নি? বাবাকে অমন কোরে কি বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়?

ছলনা কুপিত হইয়া কহিল, আমি তাড়িয়ে দিলাম না আপনি পালিয়ে গেল!

ছিঃ! বাপ্‌কে কি ওকথা বলতে আছে?

কেন বল্‌তে নেই? বাপের মত বাপ্‌ হ'লে তাকে কিছু বলতে নেই, কিন্তু অমন ধারা বাপ্‌কে সব বল্‌তে আছে। কার বাপ

অমন ক'রে দৌড়ে পালিয়ে যায়? কার বাপ্ অমন ক'রে গাঁজাগুলি খেয়ে বাইরে পড়ে থাকে? আমি খুব বল্‌ব—আরো বল্‌ব।

ললনা বিরক্ত হইয়া বলিল, এখান থেকে তুই চলে যা।

আমি কেন চলে যাব, তুই চলে যা। তুই আমার উপর গিন্নিপনা করতে আসিস্ নে।

হার মানিয়া ললনা মৌনমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, শুভদা রাসমণির কাছে একটা কাংস্যপাত্র রাখিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, বেলা অনেক হ'ল; আজ তিনি বোধহয় আর আসবেন না। এই ঘটিটা বাঁধা দিয়ে দেখ না যদি কিছু পাওয়া যায়। রাসমণি শুভদার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বড় লজ্জা করে বৌ।

ললনা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, মা, আমি একবার দেখে আসি।

শুভদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কোথায়?

ললনা মৃদু হাসিয়া একবার পিসীমাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, এই ঘোষেদের দোকানে।

তুই যাবি মা!

কেন তাতে আর লজ্জা কি? আমি এখানকার মেয়ে; ছেলেবেলা থেকে আমাকে সবাই দেখচে, আমার আর লজ্জা কি? সুসময় অসময় কার ঘরে নেই মা?

ললনা চলিয়া যায় দেখিয়া রাসমণি তাহার হস্ত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, তবে আমিই যাই।

সেদিন বেলা তিনটার পরে সকলের আহার হইল। সকলে তৃপ্ত হইলে শুভদা ললনাকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, ললনা, লুকিয়ে দুটো সজ্‌নে শাক ছিঁড়ে আন্‌ না মা ?

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিল, এত বেলায় কি হবে বল ?

আমার দরকার আছে।

কি দরকার মা ?

শুভদা অল্প হাসিয়া বলিল, তোর শুনে কি হবে ?

কথার ভাবে ললনা যেন কতক বুঝিতে পারিল। বলিল, হাঁড়িতে বুঝি ভাত নাই ?

ভাত কেন থাক্‌বে না ?

তবে কেন ?

গৃহস্থ ঘর ; দুটো সিদ্ধ ক'রে রাখতে দোষ কি ? ললনা কাতর হইয়া বলিল, সত্যি কথা বল না মা, কি হয়েছে ?

কি আবার হবে ?

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লুকিয়ো না মা। ললনা পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল ; জননী তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। আরো একটু নিকটে আসিয়া তাহার কপালের উপর চুলগুলি কানের পাশে গুঁজিয়া দিতে দিতে প্রসন্ন মুখে বলিলেন, একজনের বেশি ভাত নেই ; তিনি যদি আসেন, তাই—

তাই বুঝি তুমি শুধু সজ্‌নে পাতা চিবিয়ে থাকবে ?

শুভদা পূর্ব্বের মত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সজ্‌নে পাতা কি অখাদ্য ?

অখাদ্য নয় বলে কি শুধু খায় ?

তা হোক। তখন তুই ত বল্‌লি ললনা, সুসময় অসময় কার ঘরে নেই! তাই অসময়ে সুসময়ের কথা মনে রাখ্‌তে নেই। আবার যখন ভগবান মাপ্‌বেন তখন আবার সব হবে। তখন—এবার শুভদার চক্ষেও জল আসিয়া পড়িল।

ললনা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জননীর পদপ্রান্তে একরাশি সজিনার পাতা ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরিয়া বামুনপাড়ার একটি ক্ষুদ্র মুদির দোকানের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দোকানটি ক্ষুদ্র। দুই-এক পয়সার খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা এস্থানে আসে না। কত লোক আসিতেছে; এক পয়সার তৈল কিনিতেছে, দুই পয়সার ডাল কিনিতেছে, সিকি পয়সার লবণ কিনিতেছে তারপর চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ভিক্ষুক কিন্তু কোন কথাই কহে না; ক্রয়-বিক্রয় দেখিতেছে ও দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে দোকানদারের চক্ষু সেদিকে পড়িল; তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তুমি, কি নেবে গা?

ভিক্ষুক মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না।

দোকানদার বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে মিছে এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়িও না।

এই সময় একজন খরিদ্দার বলিয়া উঠিল, ও বুঝি ভিক্ষে করতে এসেছে।

দোকানদার অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যাও যাও এখানে কিছু মিলবে না। সন্ধ্যার সময় আবার ভিক্ষে কি?

লোকটা চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া

ঠিক পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইল, দোকানদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আবার এলে যে ?

চাল কিন্‌বে ?

কি চাল ? কত ক'রে ?

মোটা চাল।

কৈ দেখি ?

লোকটা একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ।

দোকানদার দ্রব্য দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল—এ যে ভিক্ষে করা চাল। কটা পয়সা নিবি ?

চাউল বিক্রেতা দোকানদারের মুখপানে চাহিয়া বলিল, দুআনা।

ইস্‌—চারটে পয়সা দাম হয় না আবার দুআনা ? আমি নিতে চাই নে।

লোকটাকে বোধ হয় চিনাইয়া দিতে হইবে না; ইনি আমাদের হারাণচন্দ্র !

হারাণচন্দ্র নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দোকানদারের বাপান্ত করিতে করিতে পুঁটুলি খুলিয়া মুঠা মুঠা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। এত চাল কি চার পয়সায় দেওয়া যায় ? সমস্ত দিনের মেহনতের দাম কি চার পয়সা ? আড্ডাধারীর কাছে নিয়ে যাই ত চারদিনের মৌতাত যোগায়, কিন্তু সেখানে কি যাওয়া যায় ? ছিঃ—বেটারা ভিক্ষে করা চাল চিনে ফেল্‌বে। তা হ'লে ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বাড়ি নিয়ে যাব ? কিন্তু এ কটি চাল কার মুখে দেব ? কাজ নেই।

হারাণচন্দ্র পুঁটুলিটি গুছাইয়া বাঁধিয়া আবার সেই দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানদারকে ডাকিয়া বলিল, চাল নাও।

চার পয়সায় দিবি ত ?

হাঁ।

তবে ঐ ধামাতে ঢেলে দে।

হারাণচন্দ্র একটা পাত্রে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত পাতিল। দোকানদারের নিকট চারিটি পয়সা গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া হারাণচন্দ্র একচোট খুব হাসিয়া লইল। কেমন ব্যাটাকে ঠকিয়েছি, হারামজাদার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল দিয়েছি। অর্দ্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি। ব্যাটা ধরতেও পারে নি। দোকানদার যে ধরিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই হারাণচন্দ্র তাহা একবারও মনে করিল না। মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুলিখানার ঝাঁপ খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

আর কাজ নাই ; আমরা অন্যত্র যাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আর ত পারি নে মা!

তিন দিন উপবাস করিয়া শুভদা কন্যা ললনার গলা ধরিয়া রুদ্ধাবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ললনা সযত্নে মাতৃ-অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, কেন মা অমন কর, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না—আবার সুদিন হবে।

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ঈশ্বর করুন তাই যেন হয় কিন্তু আর ত সয় না। চোখের উপর তোদের এত দুর্দ্দশা মা হয়ে আর দেখতে পারি নে। আমি মা গঙ্গার কোলে ডুব দিই, তুই মা যেমন ক'রে পারিস এদের দেখিস। দোরে দোরে ভিক্ষে করিস—উঃ—মা হ'য়ে আর পারি নে।

শুভদা যেরূপভাবে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যেরূপভাবে কন্যার

গলা জড়াইয়া ধরিল তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। সে আজ অনেক দিনের পর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে ; অনেক সহ্য করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছে, তাই আজ তাহাকে সামলাইতে পারা যাইতেছে না। যে কখনও ক্রোধ করে না, সে ক্রোধ করিলে বড় বিষম হয় ; যে বড় শান্ত তাহাতে ঝড় উঠিলে বড় প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে, তাই ললনা বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না যে এমন করিলে সে আর বরদাস্ত করিতে পারিবে না ; বুকখানা যদি ফাটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

গভীর রাত্রে মাতাপুত্রী সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শুভদার স্বামীর জন্য বড় ভয় হইয়াছে। আজ ছয় দিন হইল তিনি বাটী আসেন নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অপমানে ও লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। অপদার্থ বলিয়া কন্যা হইয়াও ছলনা সেদিন যেরূপ অপমানিত করিয়াছিল, যেরূপ গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাতে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। সেই কথাই অষ্টপ্রহর মনে হইতেছে। আজও নিশাশেষে শুভদা চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, ললনাকে তুলিয়া বলিল, ওরে তিনি নাই।

ললনা ঘুমের ঘোরে ভাল বুঝিতে পারিল না, মাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কে মা ?

আমি স্বপন দেখছিলাম যে তিনি আর নাই।

কেন মা অমন কর ? কথা শেষ করিয়াই ললনা কাঁদিয়া ফেলিল। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল তাহা দুজনে কাঁদিয়াই শেষ করিলেন।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কৃষ্ণঠাকুরাণী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় পথিপার্শ্বে মুখুয্যে বাটীতে একবার প্রবেশ করিয়া অঙ্গন হইতে ডাকিলেন, বৌ!

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরঝি ? বস।

আর বস্‌ব না দিদি—বেলা হ'ল। নেয়ে যাবার সময় একবার মনে করলাম, বৌকে দেখে যাই।

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

কৃষ্ণঠাকুরাণী গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন, বৌ একবার শুনে যাও ত।

শুভদা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হারাণের কোন খবর পেলি ?

শুভদা বলিল, না।

আজ কতদিন সে বাড়ি আসে নি ?

ছদিন হ'ল।

ছদিন আসে নি ? বামুনপাড়ায় কারুকে পাঠাস্ নি কেন ?

কাকে পাঠাব ? কে যাবে ?

তাও বটে, আমাকে বলিস নি কেন ?

শুভদা উত্তর দিল না।

জলের কলসিটি নামিয়া আসিতেছিল ; সেটাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, হাতে কিছু টাকা-কড়ি আছে কি ?

কিছু না।

তবে সংসার চলছে কেমন ক'রে ?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেটা কেমন আছে ?

সেই রকমই।

এখন ললনাকে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিস্।

তিনি প্রস্থান করিলে শুভদা ললনাকে ডাকিয়া বলিলেন, কেষ্ট ঠাকুরঝি তোকে একবার ডেকে গেছেন, একবার যা।

কেন ?

তা জানি নে।

ললনা কৃষ্ণপিসিমার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিল, পিসিমা দিলেন।

শুভদা মুদ্রা দুইটি অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিলেন, আর কিছু বল্‌লেন কি ?

হাঁ, বাবা এলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুভদা সেদিন ঠাকুরের উদ্দেশে অনেক প্রণাম করিল, পূজার কক্ষস্থিত কালীপট প্রতি বহুক্ষণাবধি যুক্ত করে চাহিয়া রহিল, তুলসীতলায় অনেক মাথা খুঁড়িল, তাহার পর জিনিসপত্র আনাইতে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

সেদিন যথা সময়ে মনোমত আহার পাইয়া ছলনাময়ী মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুতুলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে ও-পাড়ায় ললিতার নিকট প্রস্থান করিল।

রাত্রে একটু আঁধার হলে, অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আজ সমস্ত দিনের পর হারাণচন্দ্র বাটী প্রবেশ করিলেন। ছয় দিবস পূর্ব্বে তিনি যেমন ছিলেন আজো তেমনি আছেন, কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুধু বস্ত্রখানার। বর্ণটা অঙ্গার অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং গুণিয়া দেখিলে বোধ হয় শতাধিক স্থানে গাঁইট বাঁধা দেখিতে পাওয়া যাইত। সময়ে যথামত তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া শুভদা কন্যা ললনাকে ডাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা, রোজ যেন তোর মুখ দেখে উঠি—

ললনাও একটু হাসিল—কেন মা ?

আজ যে সুখ পেলাম, জন্মেও কখন এমন পাই নি!

পরদিন প্রাতঃকালে ললনা কৃষ্ণপিসিমাকে যাইয়া বলিল, কাল রাতে বাবা এসেছেন।

কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল ; যেন বড় একটা দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। স্মিতমুখে বলিলেন, এসেছে ? ভাল আছে ?

হাঁ।

এতদিন কোথায় ছিল ?

তা জানি নে।

বৌ জিজ্ঞাসা করে নি ?

না।

তোর পিসিমা কিছু বলে নি ?

না। তিনি ত বাবার সঙ্গে কথা কন না।

কথা কন না ? কেন ?

তা জানি নে। পিসিমাই জানেন।

বেলা এগারটার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কলাপাতা চাপা একটা পাথরের বাটী হাতে করিয়া শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, বৌ, একটু তরকারি এনেচি, হারাণকে দিস্।

শুভদা বাটীটা হাতে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘর উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ ঘরে আছেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, তা হোক, এখন আর যাব না, ঘরে সমস্ত জিনিস আছুড় পড়ে আছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধ উঠান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুভদাকে বলিলেন, বৌ, হারাণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি !

কি ?

এতদিন সে কোথায় ছিল।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

খাওয়াইতে বসাইয়া শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে ?

হারাণচন্দ্র মলিন মুখে অধোবদন হইয়া বলিল, গাছতলায়।

শুভদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পর দিন দুপুরবেলা কৃষ্ণপ্রিয়া আবার আসিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, বৌ, সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি ?

হাঁ।

কি বল্‌লে ?

বল্‌লেন যে গাছতলায় ছিলাম।

আবার অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। উঠিবার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কাপড়ের নিচে হইতে দুখানা থান কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, ঘরে ছিল তাই নিয়ে এলাম। হারাণকে পরতে দিস্।

শুভদা তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ বৌ, হারাণ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েছে ; তা হলে আর কারো নাম করিস। আমার নাম করিস নে।

শুভদা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কেন ?

কৃষ্ণপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না অমনি।

আর যদি নাম করি ?

এবার কৃষ্ণপ্রিয়াও সহাস্যে বলিলেন, তা হলে তোর কেষ্ট ঠাকুরঝির মাথা খাবি।

আবার একদিন দুইদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র আর আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন না। শুভদার সে পক্ষে কিছু ভয় দূর হইয়াছে, কিছু দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে, কিন্তু সংসার চলে কিরূপে ?

দুর্ভাবনার মূল হইয়াছে এইখানেই। কে একদিন এক টাকা দান করিল, কে আর একদিন দুই টাকা ভিক্ষা দিল, এমন করিয়া কি এমন পরিবার প্রতিপালিত হয়? ভাবনার কথা কি শুধু ইহাই। মাধবের মুখ দেখিলে ত শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত জল হইয়া যায়; তাহার উপর ছলনা। সে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; বিবাহের সময় হইয়াছে, এমন কি দুই-চারি মাসের মধ্যে হয়ত সে বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। এদিকে চাহিলে শুভদা আর কূল-কিনারা দেখিতে পায় না। মাধবের নিকট পার আছে কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই। তার মুখ দেখিলে রক্ত জল হইয়া যায় কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে শরীরের অস্থিপঞ্জর পর্য্যন্ত তরল হইয়া পড়িবার উপক্রম করে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় শুভদা যে প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে তাহা আর কেহ না দেখিতে পাইলেও ললনা দেখিতে পাইত। গঙ্গার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে জননী যে হাঁপাইতে থাকেন, ললনা তাহা দেখিতে পাইত; তরকারি কুটিবার সময় আলু পটলের খোসা ছাড়াইতে গিয়া হাত আটকাইয়া বাধিয়া যায়, ললনা তাহা জানিতে পারিত; গ্রামে শুভদার মত কেহ সুপারি কাটিতে পারিত না, সেই শুভদার সুপারি কাটা আজকাল সরু মোটা হইয়া যায়, ললনা তাহা বুঝিতে পারিত; আহার কমিয়া গিয়াছে, দুইবেলার পরিবর্ত্তে আজকাল বেলা চারিটার সময় একবার দাঁড়াইয়াছে; পীড়াপীড়ি করিলে বলে আদতে ক্ষুধা নাই। ললনা এসব দেখিত আর লুকাইয়া চক্ষু মুছিত; কখন কখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিত। ইহাতে ফল হইবার হইলে হইতে পারিত, কিন্তু জগতে তাহা হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আজ একাদশী। ললনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল জননী রন্ধন করিতেছেন। চুলার ভিতর দেখিল কি একটা পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। চিনিতে না পারিয়া বলিল, ওটা কি মা? কি পোড়াচ্চ?

চারটি সরষে ফুল।

কি হবে?

ছলনা খাবে। আজ নেয়ে আসবার সময় ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল। ভেজে দিতে ব'লেছিল, কিন্তু তেল ত নেই তাই কলাপাত জড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি।

ললনা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না!

আহারের সময় সাধের সরিষার ফুলের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া ছলনাময়ী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই বুঝি ভাজা হয়েচে? এ ছাই হয়েচে।

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, একটু পুড়ে গেছে।

আমি খেতে চাই নে। তুমি বুঝি পোড়া জিনিস ভালবাস, তাই নিজের মনের মত ক'রে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে রেখেচ! তা তুমিই খেয়ো— এই রইল। ছলনা মুখখানা তেলো হাঁড়ির মত করিয়া পাতের নিচে নামাইয়া রাখিল।

ছলনা যাহা বলিল তাহা নিজের বিশ্বাস মত বলিল কি না বলিতে পারি না কিন্তু আপনার মনোমত কোন দ্রব্য না হইলে কর্কশ কথা বলিতে তাহার মত কেহই পারে না।

অনেক গজ্‌ গজ্‌ করিয়া ছলনা আহার করিয়া চলিয়া যাইলে ললনা বলিল, মা, দিন দিন ছলনা মন্দ হ'য়ে যাচ্চে; ওকে কিছু বল না কেন?

আমার ত ওকে কোন কথা বল্‌তে সাহস হয় না। একটা বল্‌লে দশটা শুনিয়ে দেয়।

শুভদা একটু ভাবিয়া বলিল, সব মেয়ে কি তোর মত হয় মা? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচ রকমের হয়। আমি খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে, কাজেই রাগ ক'রে দুটো কথা বল্‌লে স'য়ে যেতে হয়।

কিন্তু একি ভাল?

ভাল নয় তা জানি; কিন্তু কি করব? আমার সময় ভাল হ'লে ছলনাও বল্‌ত না, আমাকেও শুনতে হ'ত না! ললনাও বুঝিল জননীর কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে।

পর দিন প্রায় এই সময়েই সে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শুভদা মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, কি হ'ল?

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণপিসিমা বল্‌লেন, আর কাট্‌লেও রক্ত নেই, কুট্‌লেও মাংস নেই। তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বল, না হ'লে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকা-কড়ি কিছু দিতে পারব না।

সকল কাজ কর্ম্ম সেদিনের মত সম্পন্ন হইলে ললনা মাধবের নিকট আসিয়া বসিল।

মাধব বলিল, দিদি, তার কি হ'ল?

কার কি মাধু?

মাধু থামিয়া বলিল, সেখানে যাবার?

ললনাও অল্প থামিল, অল্প চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, সেই কথাই আজ তোকে ব'লব মাধু।

মাধব সাগ্রহে একেবারে উঠিয়া বসিল—কি দিদি? কবে যাওয়া হবে?

আমি কাল যাব।

কাল যাবে? আর আমি?

আমি আগে যাই তার পরে যেয়ো।

মাধব ব্যস্তসহ বলিল, কেন, একসঙ্গেই যাই চল না!

ললনা বলিল, না, তা হ'লে মা বড় কাঁদবেন।

মাধব ক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদুক্ গে।

ছিঃ তা কি হয়? আমি যাই।

আবার কবে আস্‌বে?

তুমি যে দিন যাবে, সেই দিন আর একবার আস্‌ব।

তার মধ্যে আর আস্‌বে না?

না।

আমি কবে যাব?

আমি যে দিন নিতে আস্‌ব।

আস্‌বে?

হাঁ।

তুমি গেলে মা কাঁদবেন?

বোধ হয়।

মাধব কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, দিদি, তবে গিয়ে কাজ নেই।

কেন ভাই?

মা কাঁদবে মনে হ'লে আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তবে তুই যাবি নে?

মাধব আবার কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, হ্যাঁ যাব।

তবে আমি কাল যাব ?

যেয়ো।

আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবি নে ?

কবে আমাকে নিতে আসবে ?

আর কিছুদিন পরে।

তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধবের অলক্ষিতে ললনা দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি গেলে এসব কথা মাকে ব'লো না।

না।

মা যখন যা বলবেন, তাই শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

খাব।

কিছুক্ষণ থামিয়া ললনা আবার বলিল, মাধু, সদাদাদাকে তোমার মনে আছে ?

আছে।

তিনি যদি আসেন—যদি তোমাকে দেখতে আসেন—তা হলে বলো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাক্‌বে তখন ব'লো।

আচ্ছা।

এই সময়ে শুভদা আসিয়া বলিলেন, অনেক রাত হ'য়েছে, তুই শুগে যা মা।

মাধব সে কথার উত্তরে বলিল, মা, দিদি আজ আমার কাছে শোবে।

দিদিকে ছাড়িতে মাধবের তখন কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। শুভদা

বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ললনাকে বলিলেন, তবে তাই শোও—আমি ওপরে ছলনার কাছে শুই গে।

শুভদা চলিয়া গেলেও ভ্রাতা-ভগিনীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল, তাহার পর মাধবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকাল বেলায় সে যে সকল গৃহকর্ম্ম করে তাহা এখন পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে। বেলা আট-নয়টা বাজে দেখিয়া শুভদা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি কোথায়? ছলনাকে বলিলেন, তোর দিদি কোথায় গেল?

সবাই বলিল, বলতে পারি না।

বেলা অধিক হয় দেখিয়া শুভদা সমস্ত কর্ম্ম নিজেই করিতে লাগিলেন; ছলনাও সেদিন অনেক সাহায্য করিল। আহার্য্য প্রস্তুত হইল, সকলে আহার করিল—দ্বিপ্রহরও অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি ললনার দেখা নাই।

রাসমণি খুঁজিতে গেলেন, ছলনাময়ীও আহার করিয়া পাড়া বেড়াইতে গেল, সেখানে যদি ললনা থাকে ত পাঠাইয়া দিবে সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাসমণি আসিয়া বলিলেন, কোথাও ত তাকে পেলাম না—বাড়ি এসেছে কি?

কই না।

সন্ধ্যার পর ছলনাও ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি এ গাঁয়ে নাই।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ললনা আসিল না।

হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন নাই, তিনিও, তাই ত মেয়েটা গেল কোথা, বলিয়া একবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি বারটার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত, তাই ত—কিছুই যে বোঝা যায় না।

সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিল, রাসমণি কাঁদিতে লাগিলেন, ছলনাও কাঁদিল; শুধু মাধবচন্দ্র বড় একটা কিছু বলিল না। সকলের ব্যস্ততা এবং ক্রন্দনাদি দেখিয়া সে একবার কথাটা ভাঙ্গিতে গিয়াছিল কিন্তু দিদির নিষেধ মনে করিয়া জননীর অশ্রু দেখিয়াও মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন আসিল। সূর্য্য উঠিল, অস্ত গেল—রাত্রি হইল। আবার প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল, অস্ত গেল কিন্তু ললনা আসিল না। গ্রামের সকলেই একথা শুনিল। ললনাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাই তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কাঁদিল, কেহ শুভদাকে বুঝাইতে আসিল, কেহ পাঁচ রকম অনুমান করিতে লাগিল, এইরূপে চার-পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল।

শুভদা প্রথমে মাধবচন্দ্রের সম্মুখেও ললনার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু যখন তাহার কথা মনে হইল তখন সমস্ত অশ্রু প্রতিষেধ করিল। জননীর অধিক ক্লেশ দেখিলে বোধহয় সে ভিতরের কথা বলিয়া ফেলিত কিন্তু যখন দেখিল সব থামিয়া গিয়াছে তখন আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শুভদা বড় বিস্মিত হইল। বড়দিদির কথা মাধব কেন জিজ্ঞাসা করে না? একবার বলে না, দিদি কোথায়? একবারও জিজ্ঞাসা করে না বড়দিদি আসে না কেন? শুভদার অল্প সন্দেহ হইত—মাধব বোধহয় কিছু জানে; কিন্তু সাহস করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

আজ ছয় দিবস পরে নন্দ জেলেনি গঙ্গায় মৎস্য ধরিতে ধরিতে আঘাটায় একটা চওড়া লাল পেড়ে কাপড় অর্দ্ধজলে অর্দ্ধস্থলে বালুমাখা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। হারাণবাবুর বাটীর নিকটেই তাহার বাটী; সে ললনাকে ঐ কাপড় অনেক দিন পরিতে দেখিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইল বোধহয় ঐ বস্ত্র ললনার হইতে পারে। সে আসিয়া একথা

রাসমণিকে জানাইল। তিনি ছুটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তাহা ললনারই বটে। কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানা বাটীতে তুলিয়া আনিলেন, শুভদা দেখিলেন, হারাণচন্দ্র দেখিল, ছলনা দেখিল, পাড়ার আরো পাঁচজন দেখিল—ঠিক তাহাই বটে। সে কাপড় ললনারই। তাহার হাতের সেলাই করা, তাহার হাতের তালি দেওয়া, তাহার হাতের এক কোণে লাল সূতা দিয়া নাম লেখা। আর কি ভুল হয়? শুভদা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল মুখুয্যেদের ললনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একদিন মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, বায়ু পরিবর্ত্তন না করিলে হয়ত কঠিন পীড়া জন্মাইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর অনেক আয়। বয়স অধিক নহে; বোধহয় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না; এই বয়সে অনেক সখ, তাই পাত্রমিত্রের অভাব নাই। দুই-চারি জনকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—তোমরা কি বল? সকলেই তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। তাহারা অনেক দিন হইতে একথা বুঝিতে পারিয়াছিল কিন্তু পাছে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় এইজন্যই সাহস করিয়া বলে নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিবার বোধহয় প্রয়োজন হইবে না, আমার বিশ্বাস বায়ু পরিবর্ত্তন করিলেই সব আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ইহাতেও কাহারো সন্দেহ ছিল না। বায়ু পরিবর্ত্তনের মত ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমরা বলতে পার কোন স্থানের বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

তখন অনেকে অনেক স্থানের নাম করিল।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বলি কিছুদিন জলের উপর বাস করলে হয় না!

সকলে বলিল, ইহা অতি চমৎকার।

তখন জলযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড একখানা বজরা নানারূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। দুই-তিন মাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে সমস্ত বোঝাই হইল। তাহার পর দিন দেখিয়া পাঁজি খুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে ইয়ার বন্ধু গায়কবাদক অনেকে চলিল; তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল। মাঝিরা পাল তুলিয়া বদর বলিয়া রূপনারায়ণ নদে বজরা ভাসাইয়া দিল।

অনুকূল বাতাসে পাল ভরে বৃহৎ বজরা রাজহংসীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। স্থানে স্থানে নোঙ্গর করা হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রবাবু সদলবলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে জলে স্থলে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল, অনেক দিন কাটিয়া গেল; তাহার পর বজরা [illegible]তায় আসিয়া লাগিল। অপরাপর সকলের ইচ্ছা ছিল এই স্থানে যেন অধিক দিন থাকা হয় কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, কলকাতার বায়ু অপেক্ষাকৃত দূষিত, এখানে থাকব না। বজরা উত্তর-মুখে চলিল।

বজরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিতে লাগিল যে অনেক দিন বজরায় বাস করা হইয়াছে, বহুত জলকণা সম্পৃক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শরীরে আরাম এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন করা হইয়াছে, এখন বাটী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির মুখ দেখিতে পারিলে শরীরের কান্তিটা সম্ভতঃ আরো একটু বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এই হিসাবে আর অধিক দূর যাইতে অনেকেই মনে মনে অনিচ্ছুক হইল; আর দুই-এক দিন পরে মুখ ফুটিয়া দুই-এক জন বলিয়াও ফেলিল, অনেক দিন দেশ ছেড়ে আসা হয়েছে—আপনার শরীরও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে—এখন ফিরলে হানি কি?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হানি কিছুই নাই কিন্তু এখন ফিরিব না, তোমাদের যদি বাড়ির জন্য মন খারাপ হ'য়ে থাকে ত তোমরা যাও।

সামান্য বাড়ির জন্য, তুচ্ছ স্ত্রীপুত্রের জন্য মন খারাপ হইয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করিয়া, যাহারা কথা পাড়িয়াছিল তাহারা চুপ করিয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবু আর অন্য কথা বলিলেন না।

বজরা থামিয়া থামিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল, ভিতরে কিন্তু আর পূর্ব্বের মত সুখ নাই। সুরেন্দ্রবাবু ভিন্ন অনেকেই প্রায় বিষণ্নতায় সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন দুই দিবস পূর্ব্বে কাপুরুষতা মনে করিয়া যাহারা কথা পাড়িয়াও চাপিয়া গিয়াছিল, তাহারা পৌরুষের গর্ব্ব ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই কথা পাড়িবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। প্রবাসে থাকিয়া বাটী যাইবার কথা—স্ত্রীপুত্রের মুখ মনে পড়িয়া সেইখানে ফিরিয়া যাইবার একবার বাসনা হইলে তাহা আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখা যায় না। এক দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই মনে হয় যেন এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদেরও তাহাই হইল। আর তিন-চার দিনে প্রায় সকলেই লজ্জার মাথা খাইয়া বাটী ফিরিতে ইচ্ছা-প্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু আপত্তি করিলেন না; তখন বজরা চন্দননগর অতিক্রম না করিতেই প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। ভৃত্যবর্গ ভিন্ন বজরা প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল একজন পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী বাদক ও একজন অনুগৃহীতা নর্ত্তকী রহিল। বাবু তাঁহাদের লইয়াই চলিলেন—দেশে ফিরিবার কথা একবারও মনে করিলেন না।

একদিন বৈকালে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই পশ্চিমদিকে মেঘ করিয়া

আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিলেন, হরিচরণ, মেঘ করে আসছে দেখছ ?

আজ্ঞে হাঁ।

ঝড় হবে বলে বোধহয় কি ?

বোশেখ-জ্যোষ্টি মাসে ঝড় হওয়া আশ্চয্যি কি বাবু ?

তবে বজরা বাঁধ।

এখানে কিন্তু গাঁ আছে বলে মনে হচ্চে না; আঘাটায় লাগাব কি ?

লাগাবে না ত কি ডুবে মরব ?

মাঝি একটু হাসিয়া বলিল, আমি থাক্‌তে সে ভয় নেই বাবু! ঝড় আসবার আগেই নঙ্গর করব।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সাহস ক'রে কাজ নেই—তুমি কাছি কর।

অগত্যা হরিচরণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া বজরা বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বজরায় ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ওস্তাদজীকে ডেকে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী, মাথায় একহস্ত উচ্চ পাগড়ি বাঁধিয়া দাড়িটা কর্ণমূলে জড়াইয়া, গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে আসিয়া বলিল, হুজুর।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারে তীরের অনতিদূরে জলের উপর কাল মত কি একটা পদার্থ ভাসিয়া আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। পদার্থটা একটা মনুষ্য মস্তক বলিয়া বোধ হইতেছিল—তাহাই মনোযোগ করিয়া

দেখিতেছিলেন। ওস্তাদজীর শব্দ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করিল না। ওস্তাদজী উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু ফিরিয়া চাহিলেন। ওস্তাদজীকে দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, এখন বোধ হয় ঝড় আসবে না; একটু গীতবাদ্য হোক।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, যো হুকুম।

সুরেন্দ্রবাবু আবার সেই পদার্থটা দেখিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একজন যুবতী আসিয়া নিকটে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। পশ্চাতে ওস্তাদজী বাঁয়া তবলা হাতে করিয়া ছাদের উপর উঠিতেছিল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, তুমি নিচে যাও—বাজনার আর কাজ নেই; আজ শুধু গান হোক।

ওস্তাদজী একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া নামিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বেই যে স্ত্রীলোকটি গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছিল তাহার নাম জয়াবতী; বয়সে বোধহয় বিংশতি হইবে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখিতে মন্দ নহে; বহু দিবস হইতে সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, সাজসজ্জার আড়ম্বর বেশী কিছু ছিল না। একখানা দেশী কালো পেড়ে শাড়ি ও দুই-এক খানা গহনা পরিয়া শিষ্ট শান্ত ঘরের বধূটির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, জয়া, আজ যে তোমাকে সমস্ত দিন দেখি নাই?

মাথার বেদনায় সমস্ত দিন শুয়ে ছিলাম।

এখন ভাল হয়েছে কি?

জয়াবতী অল্প হাসিয়া বলিল, অল্প।

গান গাইতে পারবে কি?

জয়াবতী আবার হাসিল—হুকুম করুন।

হুকুম আর কি, যা ইচ্ছা হয় গাও।

জয়াবতী গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারস্থিত ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থটার পানে চক্ষু রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ পরে, জয়াবতীর গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, জয়া, ওটা নড়ে বেড়াচ্চে—না ?

জয়াবতী গান ছাড়িয়া সেটা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, বোধ হয়।

তবে আমার দুরবীণটা। ডাকিয়া বলিলেন, ওরে নিচে থেকে আমার দুরবীণের বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

দুরবীণ আসিল, বাক্স খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পদার্থটা দেখিয়া দুরবীণ বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা ?

একজন মানুষ বলে বোধহয়।

এতক্ষণ ধরে জলে কি কচ্চে ?

তা জানি নে। দেখলে হয়।

একজন লোক পাঠিয়ে দিন।

আমি নিজেই যাব। অনুজ্ঞা মত একজন মাঝি অল্পক্ষণ পরে বজরা-সংলগ্ন বোট লইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ও-পারে চল।

বোট কাছে আসিলে সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, পদ্মের মতো অনিন্দ্য-সুন্দর একজন স্ত্রীলোক গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, কাল মেঘের মত একরাশি চুল নীল জলের উপর চতুর্দ্দিকে ভাসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু আরও নিকটে আসিলেন, তথাপি স্ত্রীলোকটা উঠিল না বা

উঠিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল না, যেমন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?

স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি বলতে পারি না। বোধহয় নাই।

তবে তুমি এখানে কোথা হ'তে এলে?

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া রহিল।

তোমার বাড়ি কি নিকটেই?

না; অনেক দূর।

তবে এখানে কেন?

আমাদের নৌকা ডুবে গিয়েছিল।

কবে?

কাল রাত্রে?

তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বলতে পারি না।

তুমি এতক্ষণ ধরে জলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম অনুসন্ধান কর নাই কেন?

সে পুনর্ব্বার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি এখান হ'তে কত দুরে হবে?

প্রায় দশ-বার ক্রোশ।

কোন্ দিকে?

সুরেন্দ্রবাবুর বজরা যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐদিকে।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি ঐ দিকেই যাব। আমার বজরায় স্ত্রীলোক আছে, যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে ত আমার সঙ্গে এস; তোমাকে বাটী পৌঁছিয়ে দিব।

আবার সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যাবে?

যাব।

তবে এস।

পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আমার কাপড় ভেসে গিয়েছে।

এইবার সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, সে কি জন্য এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছে। নিজে তীরে নামিয়া মাঝিকে পুনরায় বজরায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্র আনিতে বলিয়া দিয়া বলিলেন, কাপড় এলে আমার সঙ্গে যাবে ত?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল যাব।

মাঝি বস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিল, অল্পক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন।

বজরায় আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু আগন্তুককে জয়াবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন; সে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, যত্ন, আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে আপনার কামরায় সে রাত্রের মত লইয়া গেল।

আহার করাইয়া, পান দিয়া কাছে বসিয়া জয়াবতী কহিল, ভাই তোমার নামটি?

আমার নাম মালতী। তোমার নাম?

জয়াবতী। তোমাদের বাড়ী?

মহেশপুরে।

এখান থেকে কত দূরে?

প্রায় দশ-বার ক্রোশ উত্তরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথা ভাই ?

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোথাও নয়।

সে কি—বিয়ে হয় নি ?

হ'য়েছিল, কিন্তু সে সব চুকে গেছে।

জয়াবতী একটু দুঃখিত ভাবে কহিল, কতদিন ?

অনেক দিন। আমার সে সব কথা ভাল মনে পড়ে না।

জয়াবতী একথা চাপা দিয়া বলিল, তোমাদের বাড়িতে কে আছে ?

কেউ নেই। এক পিসি ছিল, তিনিও বোধহয় বেঁচে নেই।

জয়াবতী বুঝিল নৌকাডুবির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং একথারও আন্দোলন করা উচিত মনে করিল না। কহিল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ভাই ?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সাগরদ্বীপে।

যারা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কি হ'ল ?

জানি নে।

এখন বাড়ি যাবে ?

তাই ভাব্‌চি।

জয়াবতী অল্প হাসিল, অপ্রস্তুতভাবে বলিল, আমার সঙ্গে যাবে ?

নিয়ে গেলেই যাই। তোমার স্বামী আমার অনেক উপকার করেছেন। আর বাড়িতেও আমার কেউ নেই। বাড়ি গেলেও যে কার কাছে থাক্‌ব তা ত জানি নে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া জয়াবতী জিভ কাটিয়া ছিল ; উত্তর শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল। জয়াবতীর মনে হইল—মালতীকে লইয়া যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইবে না। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট—

মালতী বলিল, তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

নারায়ণপুরে।

কোথায় যাচ্ছিলে ?

বেড়াতে। বাবুর শরীর ভাল নয় তাই—

আরও দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পর সে রাত্রের মত দুইজনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রিটা সুরেন্দ্রবাবুর ভাল নিদ্রা হইল না, সেই জন্য অতি প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাত মুখ ধুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। হাওয়ার জোর ছিল, পাল তুলিয়া মাঝি-মাল্লারা বজরা খুলিয়া দিল। একটু বেলা হইলে, জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকটির কিছু জান্‌তে পেরেছ ?

সমস্ত।

বাড়ি কোথায় ?

মহেশপুরে।

মহেশপুর কোথায় ?

তা জানি নে। এখান থেকে দশ-বার ক্রোশ উত্তরে।

বাপের নাম কি ?

জিজ্ঞাসা করি নি।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, সব খবরই জেনেছ দেখচি! স্বামীর নাম কি ?

স্বামী নেই!

শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?

বলে নি।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জাত জান কি ?

না।

নাম জান ?

জানি ; মালতী।

মালতীর যদি আপত্তি না থাকে ত একবার আমার কামরায় ডাক্‌তে ব'লো—আমি নিজে সব কথা জিজ্ঞাসা করব।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, কামরায় আসুন।

সুরেন্দ্রবাবুও কালবিলম্ব না করিয়া কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিচে গালিচার উপর মালতী অধোবদনে বসিয়াছিল। জয়াবতীও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিবামাত্র সে প্রস্থান করিল। এসকল সে জানিত ; হয়ত তাহার সম্মুখে সব কথা না হইতে পারে, হয়ত কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে তাহা বুঝিত—তাই সরিয়া গেল কিন্তু অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল কি না, সব কথা শুনিবার বাসনা তাহার ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সুরেন্দ্রবাবু একটা কোচে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নীরবে বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ; মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ, কিন্তু বড় মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল ; বর্ণটা বড় সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তাঁহার বোধ হইল এতটা রূপ একসঙ্গে তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। বিধবা—কি জাতি ? সুরেন্দ্রবাবু মুখ ফুটিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নাম কি ?

মালতী বলিল, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি বাটীতেই আছেন ?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, না; তিনি নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বলিলেন, বাটীতে আর কে আছে?

এইবার মালতী বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল; তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিল, বোধহয় কেউ নাই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

সেইখানেই ছিলাম কিন্তু আমরা সাগরে যাচ্ছিলাম, পথের মাঝে নৌকাডুবি হয়েছে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কালিপাড়ায়।

সেখানে তোমার কে আছে?

হয়ত কেউ আছে কিন্তু আমি তাদের চিনি না।

কখন সেখানে যাও নাই?

বিবাহের সময় একবারমাত্র গিয়েছিলাম।

সুরেন্দ্রবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার বাপের বাড়িতেও কেউ নাই, শ্বশুরবাড়িতেও কেউ নাই, অন্ততঃ তুমি জান না—তবে এখন কোথায় যাবে?

কলকাতায়।

কলকাতায়? সেখানে কে আছেন?

কেউ না।

কেউ না? তবে কোথায় থাকবে?

কারও বাটী অনুসন্ধান করে নেব।

তার পর?

মালতী মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুমি রাঁধতে জান ?

জানি।

কলকাতায় কোথাও রাঁধতে পেলে থাকবে ?

হাঁ।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মালতী, কলকাতা ভিন্ন আর কোথাও ঐ কাজ পেলে করবে কি ?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বোধ হইল যেন সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তরে কিছু বিমর্ষ হইলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, কলকাতায় যা আশা কর, অন্যস্থানে তার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ পেলেও করবে না কি ?

মালতী পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িল। বলিল, কলকাতা ভিন্ন আর কোথাও আমি যাব না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ম্লান মুখ দেখিয়া মালতীও বুঝিতে পারিল যে তাহার কথা সুরেন্দ্রবাবুর মনোমত হয় নাই ; সম্ভবতঃ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, যারা কলকাতা চেনে না তাদের পক্ষে কলকাতা অতি মন্দ স্থান ; তোমার যা অভিলাষ ক'রো কিন্তু খুব সাবধানে থেকো। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নারায়ণপুরে বাটী, যদি কখন প্রয়োজন মনে কর আমাকে সম্বাদ দিও কিম্বা আমার বাটীতে যেও। আপদ বিপদে উপকার করলেও করতে পারি।

মালতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমরা এক সপ্তাহ পরে কলকাতা অভিমুখে ফিরব। এখন এই বজরাতেই থাক ; যখন কলকাতায় পৌঁছব তখন নেমে যেও।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে মালতী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবুর কথাতে সে বেদনা পাইয়াছিল কিন্তু কাঁদিবার আরো শত সহস্র কারণ ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, বজরায় স্থান দিয়াছেন, আরো অধিক উপকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াছেন কিন্তু সে কি রাঁধিতে মাত্র কলিকাতায় যাইতেছে? স্নেহময়ী মাতা, পীড়িত ভ্রাতা, নিঃসহায় সংসার সে কি শুধু রাঁধিয়া নিজের উদর পরিপূরণ করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে? পাচিকার কর্ম্ম ছল মাত্র। সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে চাহে এবং কলিকাতা ভিন্ন অর্থ কোথায়? অর্থোপার্জ্জনের পথও সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী রূপবতী; শরীরে তাহার রূপ ধরে না এ কথা সে টের পাইয়াছে; কলিকাতা বড় সহর। সেখানে ঐ রূপ লইয়া গেলে বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না, হয়ত আশাতীত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে, তাই কলিকাতা যাইতে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে! সেখানে তাহার আদর হইবে, দরিদ্র ছিল ধনবতী হইবে, ক্লেশে জীবন কাটিতেছিল এইবার সুখে কাটিবে, তথাপি মালতী কাঁদে কেন? আমরা জানি না—তাহার কথা সেই জানে।

পরদিন বজরা হলুদপুর গ্রামের নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল, মালতী খড়খড়ি খুলিয়া বাঁধা ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে জনপ্রাণী নাই—যে আশায় মালতী চাহিয়া রহিল তাহা হইল না। গ্রাম ছাড়িয়া বজরা দূরে চলিয়া গেল, মালতী জানালা বন্ধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়াবতী নিকটে আসিয়া বসিল, চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল, কেঁদে আর কি হবে বোন? তাঁদের সময় হয়েছিল তাই মা গঙ্গা কোলে নিয়েছেন। জয়াবতী ভাবিল, নৌকাডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের জন্যই মালতী কাঁদিতেছে। সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

জয়াবতী মালতী অপেক্ষা বয়সে বড়, তাহাকে স্নেহ করে, ছোট ভগিনীর মত দেখে; বিশেষ, মালতী কলিকাতায় নামিয়া যাইবে শুনিয়া স্নেহ আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মালতী উঠিয়া বসিলে জয়াবতী অন্যান্য কথা-বার্ত্তায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৺কাশীধামে মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই সদানন্দর পিসীমাতা কাশী যাইলেন কিন্তু আর ফিরিলেন না। সদানন্দ পুণ্যশরীরা পিসীমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া চির শিবলোক বাসের সুব্যবস্থা করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিল।

শূন্য বাটীতে অনেক রাত্রে প্রবেশ করিয়া সদাপাগলা নিজ হস্তে দুটো সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। একবার মনে করিল তখনই হারাণ-বাবুর বাটীতে গিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবে কিন্তু অত রাত্রে দেখাশুনার সুবিধা না হইতে পারে মনে ভাবিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল। কাশী থাকিয়া সে হারাণবাবুর দুশ্চরিত্রের কথা, শুভদার দুরদৃষ্টের কথা, ললনার হতভাগ্যের কথা মনে করিত; রোগের সেবা করিতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়াও সে উহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। মধ্যে একবার পত্র লিখিয়া সম্বাদ অবগত হইয়াছিল কিন্তু তাহার পর আর কোন পক্ষেই পত্রাদি লিখেন নাই—সদানন্দও তাই প্রায় একমাস-কাল কোন সম্বাদ জানিতে পারে নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সেই সব কথা মনে করিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া, চালাঘরের বাতার পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে করিতে লাগিল, মেঘের উপর পদ্ম ফুল ফুটে কি না? ললনা বলিয়াছিল,

মাটি ভিন্ন ফুল ফুটে না—সে কথা সঙ্গত কি না? আর এ কথা যে বলিয়াছিল সে কেমন করিয়া জানিল মেঘের উপর পদ্ম ফুটিতে পারে না? যাহৌক রাত্রি শেষে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে সদানন্দ স্থির করিয়া ফেলিল যে, উপরে পদ্ম ফুটিতে পারে কিন্তু ফুটিয়া অনেকদিন থাকিতে পারে না, শুকাইয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা—শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে বোধ হয়।

পরদিন শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ফুল, বেলপাত, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ইত্যাদি বহু দ্রব্য হস্তে লইয়া একেবারে হারাণবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই শুভদাকে দেখিতে পাইল। শুভদা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, খ্যাংরাটা ফেলিয়া দিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া শুভদা মৃদুস্বরে বলিল, কবে এলে সদানন্দ?

কাল রাত্রে।

সকলে ভাল আছেন?

সদানন্দ দুঃখিতভাবে অল্প হাসিয়া বলিল, সকলের মধ্যে ত পিসীমা; তিনি কাশীতেই স্থান পেয়েছেন।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি পেয়েছেন?

পিসীমাতার কাশীতেই মৃত্যু হয়েছে।

শুভদা একথা জানিত না; তাহার এক শোকে আর এক শোক উথলিয়া উঠিল। শুভদা কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, বাবা, ললনাও নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, নাই? কোথায় গিয়েছে?

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কোথায় আর যাবে—বাছা সংসারের দুঃখে কষ্টে আত্মঘাতী হয়েছে। পাঁচদিন হ'ল গঙ্গার তীরে

তার পরণের কাপড়টি পাওয়া গেছে। শুভদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সদানন্দও চক্ষুর জল মুছিল, কিন্তু এক ফোঁটা কিম্বা দুই ফোঁটা মাত্র। তাহার পর শুভদা যতক্ষণ না শান্ত হইল ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শুভদা শান্ত হইলে বলিল, কিছু বলে যায় নি?

কিছু না!

হারাণকাকা কোথায় আছেন?

শুভদা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, বলতে পারি না। কখন কখন বাটীতে আসেন বটে।

তিনি এখন কি করছেন?

তাও জানি না।

মাধব কেমন আছে?

পূর্ব্বের মত।

আর সকলে?

ভাল আছে।

সদানন্দ উঠিতেছিল। শুভদা বলিল, তোমার ওখানে রাঁধবে কে?

আমি নিজে।

শুভদা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এখানে খেলে হয় না?

হবে না কেন। কিন্তু তার দরকার কি, রাঁধতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তা হোক তুমি এখানে খেয়ো।

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আজ নয়। আজ পিসীমার তর্পণ করতে হবে।

শুভদা ভাবিল, তা হবেও, তাই কোন কথা আর বলিল না।

সদানন্দ বাটী আসিয়া একটা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল। তখন বেলা আটটা বাজিয়াছিল, পরে যখন ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে—জ্যোৎস্না রাত্রি ফুটফুট করিতেছে; সদানন্দ বাহিরে আসিয়া একটা বাগান পার হইয়া সারদাচরণের বাটীর পশ্চাতে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল, চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, সারদা!

সারদা গৃহে ছিল সদানন্দর ডাক শুনিতে পাইল। জানালার নিকট আসিয়া বলিল, কে?

সদানন্দ বলিল, আমি।

কে—সদানন্দ?

হাঁ।

কবে এলে?

কাল রাত্রে।

এদিকে কেন? চল বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

না ও-দিকে যাব না, তুমি এখানেই এস।

সারদাচরণ নিকটে আসিলে সদানন্দ বলিল, ললনা মরেছে তা জান কি?

সারদাচরণ বিষণ্ণভাবে কহিল, জানি।

কেন মর্‌ল কোন সম্বাদ রাখ কি?

না, তবে বোধ হয় সাংসারিক দুঃখে কষ্টে আত্মঘাতী হয়েছে।

সদানন্দ তাহার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আর কিছু জান না?

কিছু না।

সদানন্দ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিল, তুমি পাষণ্ড।

সাংসারিক দুঃখে কষ্টে একজন মরতে পারে আর তুমি সম্মুখে থেকে একটু সাহায্য করতে পার না ?

সদানন্দর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া সারদাচরণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কারণও ছিল; সে এবং সদানন্দ বাল্য সুহৃৎ, উভয়ে উভয়কে বহুদিন হইতে চিনিত। সারদার ছেলেবেলার কথা সদানন্দ সমস্ত অবগত ছিল এবং সেই জন্যই যে আজ তাহাকে কথা শুনাইতে আসিয়াছিল সদানন্দর সে প্রকৃতি নহে; কিন্তু সারদা অন্যরূপ ভাবিয়া লইল। সে মনে করিল, সদানন্দ ছেলেবেলার সেই সব লইয়া দুটো কথা শুনাইয়া দিতেছে, তাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সদানন্দ, সে সকল কথায় এখন আর ফল কি ? আরো মনে করে দেখ আমার পিতা জীবিত রয়েছেন, তাঁর বর্ত্তমানে ইচ্ছা হলেই কি আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করতে পারি ? বিশেষ সে আমাকে কিছুই বলে নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইল। কহিল, কিছুই বলে নাই ? কিছুই বলতে আসে নাই ?

সম্প্রতি নয়; তবে অনেকদিন পূর্ব্বে একবার এসেছিল।

কি জন্য ? কোথায় ?

সারদাচরণ বলিল, বলছি। প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে, অনেক রাত্রে, আমাকে ঐ শিবমন্দিরে আসতে অনুরোধ করেছিল; আমার যাবার ইচ্ছা না থাকলেও গিয়েছিলাম—

সদানন্দ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যাবার ইচ্ছা ছিল না ?

সারদা ম্লানভাবে বলিল, আর কেন ভাই !

সদানন্দ সে কথা শুনিল না, বলিল, তার পর ?

তার পর বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিল।

কার সঙ্গে ?

তার নিজেরই সঙ্গে।

নিজের? ললনার সঙ্গে? তুমি কি বললে?

সারদা আপনার বাল্যকথা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইল, কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি—আমি—তা কি কর্‌ব বল? বাবা এখনো বেঁচে আছেন।

সদানন্দ কতকটা ক্রোধে, দুঃখে, কতকটা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, তোমার বাবার বেঁচে কি লাভ?

এইবার সারদাচরণ কুপিত হইল। পিতার সম্বন্ধে কোন কথা তাহার সহিত না, বলিল, লাভালাভের কথা তিনি ভাল জানেন। আমাদের এ বিষয়ে বিচার করবার কোন অধিকার নাই—ভালও দেখায় না! যা হোক আমি বললাম, তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

সে চলে গেল?

না তখনও চলে যায় নাই; ছলনাকে বিবাহ করতে বলল।

তুমি স্বীকার করলে না?

সারদাচরণ সদানন্দর মুখ দেখিয়া এবং তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, অস্বীকারও করি নাই, বলেছিলাম পিতার মত হ'লে করতে পারি।

সদানন্দ বলিল, পিতার মত হ'ল না?

না।

কেন?

বলবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বলছি শোন, বাবার ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থ লাভ করেন—হারাণবাবু কি তা দিতে পারতেন?

সদানন্দ সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না, বলিল, তোমার পিতা কি আশা করেন?

আমি বলতে পারি না।

অর্থের আশা পূর্ণ হ'লে আর কোন আপত্তি হ'তে পারে কি ?

সম্ভব নয়।

তোমার নিজের কোন আপত্তি নাই ?

কিছু না।

তবে দেখা যাক, বলিয়া সদানন্দ পুনর্ব্বার বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিল।

সারদাচরণ বলিল, কোথায় যাও ? একটু বসবে না ?

না।

সদানন্দ, আমার কোন দোষ নাই।

বোধ হয় নাই—ভগবান জানেন—আমি বলতে পারি না।

রাগ করলে ?

না।

সদানন্দ বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইল, তাহার পর পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। পথ বাহিয়া গঙ্গাপানে চলিল। ভাগীরথীর ছোট ছোট ঢেউ বাঁধাঘাটের সোপানে ঝলমল ছলছল করিয়া ঘাতপ্রতিঘাত করিয়া সরিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, সদানন্দ কিছুক্ষণ সেইগুলি দেখিতে লাগিল, দূরে একখানা বজরা ছপ ছপ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া আসিতেছে, সদানন্দ অন্য মনে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘাটের সর্ব্বনিম্ন সোপানের উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আপনার মনে আকাশ পানে চাহিয়া গান ধরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেইদিন রাত্রে জ্যোৎস্না-ধৌত প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ভাঁটার স্রোতে গা ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালনের মত ছপ ছপ করিয়া দুটি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে সুরেন্দ্রবাবুর প্রকাণ্ড বজরা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ছাদের উপরে সুরেন্দ্রবাবু ও জয়াবতী বসিয়া কথোপকথন করিতে-ছিলেন, নিচে কামরার জানালা খুলিয়া মালতী গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট রজত ঢেউগুলি গুণিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল। মালতী বুঝিতে পারিল এইবার হলুদপুরে আসিতেছে। আরো কিছুক্ষণ আসিয়া গঙ্গা-তীরের অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে বাঁধাঘাট চন্দ্রকিরণে ধপ ধপ করিতেছে তাহাও দেখিল। আর তাহার পশ্চাতে হলুদপুর গ্রাম সুপ্ত নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। মালতী তথাকার প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক নরনারীর নিদ্রিত মুখ মানস চক্ষে দেখিতে লাগিল, আর ঐ ঘাট—সে যখন ললনা ছিল, তখন দুবেলা ঐখানে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, গাত্র ধৌত করিতে আসিত; ঐ ঘাট হইতে পিত্তল কলসী পূর্ণ করিয়া জল না লইয়া গেলে পান করা, রন্ধন করা চলিত না। মালতী এখন মালতী—সে আর ললনা নহে, তবুও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারা যায় না, হারাণ মুখুয্যেকে ভুলিতে পারা যায় না, তাই ভাবিতেছিল আর কাঁদিতেছিল, আর সদাপাগলাকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। ইতিপূর্ব্বেই তাহা মালতী ভাবিয়া দেখিয়াছিল। মালতী ভাবিল, ছলনা, বিন্দু, কৃষ্ণপিসীমা, গিরিজায়া, শৈলবতী, রমা—কেউ না—কেউ না; সদানন্দ তাহার পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা লইয়া স্মৃতির অর্দ্ধেক জড়াইয়া

বসিয়া আছে, কর্ণে তাহারই গান শুনিতে পাইতেছে। মালতীর বোধ হইল যেন সদাপাগলের প্রফুল্ল সুর করুণ হইয়া অস্পষ্টভাবে কোথা হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। মালতী বিস্মিত হইল; স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ঠিক সদানন্দর মত গীত গাহিতেছে। বজরাখানা আরো একটু আগাইয়া আসিলে মালতী দেখিল ঘাটের নীচে জলে পা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে, কিন্তু গান তখন বন্ধ হইয়াছে। লোকটি কে তাহা ঠিক চিনিতে না পারিলেও মালতী পরিষ্কার বুঝিল এ সদানন্দ ভিন্ন আর কেহ নহে; পাগল ক্ষ্যাপা লোক ভিন্ন কে আর অত রাত্রে মা গঙ্গাকে গান শুনাইতে আসিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন মালতী পুনর্ব্বার কাঁদিতে বসিল। সদানন্দর কথা যত মনে করিতে লাগিল, তত ললনার কথা মনে পড়িতে লাগিল; শুভদা, ছলনা, মাধব, পিসীমা আর হতভাগা হারাণ মুখুয্যে—সকলেই সদানন্দর স্মৃতি মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য্য উঠিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। মালতী কিন্তু উঠিতে পারিল না। সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা; গা গরম হইয়াছে, মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আরো নানা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। দাসী আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, তোমার যে দেখ্‌চি জ্বর হয়েছে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। জয়াবতী আসিয়া গায়ে হাত দিল, জানালা খোলা আছে দেখিয়া একটু অনুযোগ করিল। বলিল, এমনি ক'রে কি জানালায় মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে? সমস্ত রাত্রি পূবে হাওয়া লেগে গা গরম হয়েছে।

মালতী মৃদুভাবে বলিল, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম তাই জানালা বন্ধ করা হয়নি।

সুরেন্দ্রবাবু একথা শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন। সত্যই জ্বর হইয়াছে। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল। তাহা হইতে ঔষধ লইয়া দিলেন আর জয়াবতীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

জয়াবতী মালতীর কাছে আসিয়া বসিল। জানালা শার্সি সমস্ত বন্ধ, মালতী কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, এমন কি বজরা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কামরায় জয়াবতী ভিন্ন আর কেহ নাই দেখিয়া মালতী বলিল, দিদি! জয়াবতীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আমরা কতদূর এসেছি জান?

জয়াবতী বলিল, প্রায় আট-দশ ক্রোশ হবে।

মালতী তাহা জানিতে চাহে নাই, বলিল, কলকাতা আর কত দূরে?

এখনো প্রায় দুদিনের পথ।

মালতী চুপ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইল। পরে বলিল, দিদি, যদি সে সময়ের মধ্যে ভাল না হই?

জয়াবতী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোকে এসময়ে হিংসা রাখে না—তাই একটু হাসিয়া বলিল, তা হলে আমরা তোমাকে জলে ফেলে দোব।

মালতীও একটু হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে এ হাসিতে একটু প্রভেদ ছিল। বলিল, হ'লে ভাল হ'তো দিদি।

জয়াবতী অপ্রতিভ হইল। কথাটার যে আরো একটু অন্যরূপ মানে হইতে পারে তাহা সে ততটা ভাবিয়া বলে নাই। বলিল, ছিঃ ও কথা কি বলে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল, আর উত্তর করিল না। নিঃশব্দে সে

ভাবিয়া দেখিতেছিল যে জয়াবতীর কথা সত্য হইলে কেমন হয়? ভাল হয় কি? হয় না। মরিতে তাহার সাধ নাই। তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সে মরণের অধিক ক্লেশ পাইতেছে তথাপি মরিতে পারিবে না, মরণে ভয় নাই তথাপি মরিবার ইচ্ছা নাই। যাহারা সে ইচ্ছা করিতে পারে তাহাদের দুঃখ তত অধিক নয়। একবিন্দু জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জয়াবতী সস্নেহে তাহা মুছাইয়া বলিল, ভাব কেন বোন? পূবে বাতাস লেগে একটু গা গরম হয়েচে তাই বলে ভাবতে হয়? তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া সাবধান হইয়া বলিল, আর যদি তেমন তেমন হয় তা হলেও ত উপায় আছে, কাছেই কলকাতা—সেখানে ডাক্তার বদ্দির অভাব কি?

অভাব কিছুরই ছিল না এবং প্রয়োজনও কিছুই হইল না। বজরা যেদিন কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিল সেদিন মালতীর আর জ্বর ছিল না কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, এখনো কিছুই খাইতে পায় নাই। বজরা কলিকাতা ছাড়াইয়া একটু দূরে—পরপারে নঙ্গর করা হইল। কামরার জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া মালতী জাহাজ, মাস্তুল, বড় বড় নৌকা ও প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণীর চূড়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ভয় হইতেছিল; ভাবিতেছিল এই কি কলিকাতা? তাহা হইলে এত গণ্ডগোল এত শব্দ সাড়ার মধ্যে কে কাহার কথা শুনিতে পাইবে? এত ব্যস্ত সহরে কে তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাইবে? কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহাকে যাইতে হইবে। যে জন্য এ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের মুখ মনে করিয়া নরকে ডুব দিতে বসিয়াছে—ইহকাল পরকাল কোন কথাই মনে স্থান দেয় নাই, তাহাদের মুখ এত শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। আজ না হয় কাল এ আশ্রয়

পরিত্যাগ করিতেই হইবে ; আর যখন হইবেই তখন আর ভয় করিয়া লাভ কি ?

সে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রচার করিলেন যে বজরা এস্থানে আরও তিন-চারি দিন বাঁধা থাকিবে। মালতীর শরীর রীতিমত সুস্থ হইলে তবে সে যেখানে ইচ্ছা যাইবে ; বজরাও সেই সময়ে খোলা হইবে। মালতী একথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিল ; আন্তরিক সে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল, কেননা যতই প্রয়োজনীয় এবং কর্ত্তব্য হউক না আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে যাইতে মনকে তেমন সহজে রাজী করিতে পারা যায় না, ইতিপূর্ব্বেই সে এই মর্ম্মে তাহার সহিত কলহ করিতেছিল—এখন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া সেটাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া চলনসই গোছ একরকম করিয়া লইবার মত সময় পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে জয়াবতী কলিকাতা ভ্রমণ করিতে যাইবে স্থির হইয়াছিল। গাড়ী, পানসি ঠিক করিয়া ভৃত্য সম্বাদ দিল ; জয়াবতী বাবুকে তাহার সহিত যাইতে অনেক সাধ্যসাধনা করিল কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, মালতী যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু বাবু নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন—তাহার শরীর ভাল নয়, আবার জ্বর হইতে পারে। তখন অগত্যা জয়াবতী একাই দাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল।

মালতী কামরার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া বসিল, সুরেন্দ্র-বাবু একটু দূরে উপবেশন করিলেন—অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি কিছু বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছিল না—অনেকক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই কি নিশ্চয় নেমে যাবে ?

মাথা নাড়িয়া মালতী বলিল, হাঁ।

বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখেছ কি ?

মালতী সেইরূপ ভাবে বলিল, দেখেছি।

কোথায় যাবে ?

তা ত জানি না।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, তবে আর কি দেখেছ ? আজ নয়, কাল একবার কলকাতার ভিতরটা দেখে এসো, তার পর যদি নিশ্চিত ত্যাগ ক'রে অনিশ্চিতই ভাল লাগে—যেও, আমি বারণ করব না।

মালতী কথা কহিল না।

তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা ম্লানভাবে কহিতে লাগিলেন, তুমি যতটা না ভেবেছ আমি ততটা ভেবে দেখেছি। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—হীনবৃত্তি করতে পারবে না ; ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্র সংসারে প্রবেশ করতে না পারলে তুমি থাকৃতে পারবে না ; এ অবস্থায় নিঃসহায় কেমন ক'রে যে এত বড় সহরে সমস্ত অনুসন্ধান করে নিতে পারবে আমি বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার কহিলেন, আর ভেবে দেখ, তোমার এ বয়সে মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে আপনাকে সামলিয়ে চলতে বেশ পারবে কি ? ভয় হয় পাছে পদে পদে বিপদে পড়।

মালতী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, এসকল সে সমস্তই ভাবিয়া দেখিয়াছিল কিন্তু উপায় ছিল না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন মালতী কাঁদিতেছে, পূর্ব্বেও তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন কিন্তু এখন অন্যরূপ মনে হইতে লাগিল ; বলিলেন, যাওয়াই কি স্থির করলে ?

মালতী চোখ মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে এ আখ্যা প্রদান করিত তাহাদের অপেক্ষাও তিনি বোধ হয় শতগুণ অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম্ম করিতেন এই জন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। মালতীর মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর মালতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে বলিলেন, মালতী, তোমার বড় টাকার প্রয়োজন, না?

তাহার চক্ষুজল আবার উছলাইয়া উঠিল। এত প্রয়োজন বোধ হয় জগতে আর কাহারো নাই।

বড় প্রয়োজন কি?

মালতী কান্না কতকটা শেষ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, বড় প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিলেন, বুঝিতে তাহার আর বাকি নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল, কারণ, এ সব লোকেরও যে কাঁদিবার যথার্থ কারণ থাকিতে পারে, সকলেই যে শুধু মন ভুলাইবার জন্য কাঁদে না তাহা তিনি কুসংসর্গ দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অল্প হাসিয়া অল্প চাপিয়া বলিলেন, তবে আর কাঁদছ কেন? তুমি রূপসী, তুমি যুবতী কলকাতায় যাচ্ছ—এখন আর তোমাকে অর্থের ভাবনা ভাবতে হ'বে না—কলকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখতে পাবে।

মালতীর বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নিচে পড়িয়া গিয়াছে, এখন জানালা গলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মালতী এইরূপ কিছু একটা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু

সহসা বোধ হইল যেন বাধা পড়িয়াছে, যেন মূর্চ্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নি-বিক্ষিপ্ত ; বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত ; তাহাতে যেন এক বিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অগ্নিময়। মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও মালতী শিহরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল তখন যে সে কাহারো ক্রোড়ের উপর শুইয়া আছে তাহা বোধ হইল না ; চক্ষু চাহিয়া দেখিল আপনার শয্যাতে শুইয়া আছে, কিন্তু পার্শ্বে সুরেন্দ্রবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল, দুই হাতে মুখ চাপিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, মালতী, কাল প্রাতঃকালে আমি বজরা খুলে দেব কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেব না, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মালতী শুনিতে লাগিল—যে জন্য তুমি কলকাতা যেতে চাচ্ছ তা তুমি পারবে না। এ বৃত্তি বোধ হয় তুমি পূর্ব্বে কখন কর নাই, এখনও পারবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, যা কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষ হয় আমি দেব।

মালতীর রুদ্ধ শ্বাসের সহিত চক্ষু-জল বাহির হইয়া পড়িল ; সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিলেন, সযত্নে আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, মালতী, আমার সঙ্গে চল। আমি খুব ধনী না হলেও দরিদ্র নই—তোমার ব্যয় স্বচ্ছন্দে বহন করতে পারব ; আর বল দেখি, আমি তোমাকে এখানে ফেলে গেলে বাঁচবে কি ? না, আমি শান্ত মনে বাড়ি ফিরতে পারব ? সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইলেন—আগ্রহে ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় সঙ্কুচিত সে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেমন যাবে ত ?

মালতীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল ; সে আর

সে নয় ; সে ললনা নয়, সে মালতী নয়, সে কেহ নয়, শুধু এখন যাহা আছে তাহাই ; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী, আজন্মের প্রণয়িনী ; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী ; সীতা সাবিত্রীর নাম কেন ? সে রাধা, সে চন্দ্রাবলী ; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান অপমান কি ? ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল ; সে ক্রোড় আর অস্থিময় পাষাণ, অঙ্গারবিক্ষিপ্ত নহে এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল মধুময়। ললনার বোধ হইল সে এতদিন শাপগ্রস্ত ছিল, এখন পুনরায় স্বর্গে আসিয়াছে, এতদিন পরে হৃত ধন ফিরাইয়া পাইয়াছে। মালতীর সঙ্কুচিত ওষ্ঠ পুনরায় বিস্ফারিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সে ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আর পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ললনা দেবী স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তখন সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া এ পাপচিত্র দেখিয়া যাইলেন, সে অপরাহ্ণ সূর্য্য-রক্ত-করস্পর্শে ললনার মুখমণ্ডল সুরেন্দ্রর চক্ষে সহস্রগুণ অধিক মনোমুগ্ধকর প্রতিভাত হইল ; তিনি সহস্র আবেগে সহস্র তৃষ্ণায় সে মুখ পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, মালতী, যাবে ত ?

যাব।

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্ত হইলেন—তবে চল এখনি যাই।

কিন্তু দিদি ?

কে দিদি ?

তোমার স্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথের যেন সহসা চমক ভাঙ্গিল। শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রী। সে ত অনেক দিন মরেছে।

জয়াবতী ?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাস্য করিলেন ; বলিলেন, জয়া আমার স্ত্রী নয়—তাকে কখন বিবাহ করি নাই ।

তবে কি ?

কিছু নয়—কিছু নয় । তুমি আমার সব, সে কেউ নয়—তুমি সব—তুমি সমস্ত ।

এবার মালতী তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিল, ক্রোড়ে মুখ লুকাইল,—ছিঃ ছিঃ ! মুক্তকণ্ঠে কহিল, আমি তোমার চিরদাসী, আমাকে পরিত্যাগ করো না ।

না, কখন না ।

তবে আমাকে নিয়ে চল ।

চল ।

আজ ।

এখনি ।

এই সময়ে বাহিরে শতসহস্র কণ্ঠ নানা কণ্ঠে নানারূপে চিৎকার করিয়া উঠিল, ধর ধর—সরে যাও—তফাৎ—তফাৎ—গেল গেল—ডুব্‌ল—হো হো ঐ যা—সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহির হইয়া পড়িল, সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এ-পারে, ও-পারে, চতুর্দ্দিকে, মাঝি-মাল্লা, মুটে-মজুর সমস্ত সমবেত হইয়া চিৎকার করিতেছে এবং কিছু দূরে প্রায় মধ্যগঙ্গায় একখানা পানসী ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে ।

চক্ষুর নিমিষে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন কি ঘটিয়াছে, চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ওতে আমার জয়া আছে, সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন কিন্তু পার্শ্ব হইতে মালতী ধরিয়া ফেলিল । সুরেন্দ্রনাথ পাগলের

মত ছট্‌ফট্‌ করিয়া আবার চিৎকার করিলেন, ধোরো না ধোরো না—আমার জয়া যায় যে!

ততক্ষণ ক্ষুদ্রপ্রাণ নৌকাখানি প্রকাণ্ড ষ্টীমারের তলদেশে ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথও মাঝি-মাল্লা, ভৃত্য প্রভৃতির হস্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয়া! জ্ঞান হইলে, প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আকুল ভাবে বলিয়া উঠিলেন, জয়া! পার্শ্বে মালতী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল, তাঁহার কথার ভাবে সে আরো অধিক করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। তিনি কিন্তু তাহা দেখিলেন না; একবারমাত্র চাহিয়াছিলেন, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, জয়ার কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই?

নিকটে একজন পুরাতন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে কাতরভাবে কহিল, না।

পাওয়া যায় নাই? তবে বোধ হয় সে আর বেঁচে নাই।

ভৃত্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বোধ হয়।

সুরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত হয়েছে?

প্রায় দশটা।

দশটা? তবু সম্বাদ নাই?

ভৃত্য উত্তর দিল, না।

সুরেন্দ্রবাবু অধিকতর হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিলেন,

বলিলেন, তোমরা সবাই যাও—সমস্ত সহরে সমস্ত গঙ্গার ধারে সন্ধান কর গে।

ভৃত্য মনে ভাবিল, মন্দ হুকুম নয়। মুখে বলিল, যে আজ্ঞা, পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

কক্ষে মালতী ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় অতি-বাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। কামরার দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল সেটা আপনার মনে এগারটার পরে বারটা তাহার পর একটা, দুইটা, তিনটা, চারিটা—তাহার পুঁজিপাটা সমস্ত বাজাইয়া চলিতে লাগিল কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ এ-পাশ ও-পাশ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, মালতী পাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল আর চক্ষু মুছিতে লাগিল; তাহারও কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে এবং ততোধিক নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সে ভাবিয়া দেখিতেছিল।

একে ত কলিকাতার গঙ্গা সমস্ত রাত্রিই প্রায় নিদ্রা যান না, এখন আবার চারিটা বাজিয়া গিয়াছে—চতুষ্পার্শ্বে অল্প ঈষৎ বেশ সাড়া শব্দ হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, সমস্ত রাত্রি মিথ্যে জেগে কোন ফল নাই, তুমি শোও গে!

মালতী উঠিয়া যাইতেছিল, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, বস, যেয়ো না, তোমাকে কিছু বলব।

মালতী দুই পদ অগ্রসর হইয়াছিল, পুনরায় সেই খানেই উপবেশন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু রগড়াইলেন, একবার কি বলিবেন তাহা যেন ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, মালতী, কার পাপে এই হ'ল ?

মালতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; একথা সে বহুবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; উত্তরও একরকম পাইয়াছিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে তাহার মুখ বন্ধ হইল কাজেই অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

সুরেন্দ্রবাবুও যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন, সে সব কথা পরে হবে, এখন যাও।

মালতী তথা হইতে আপনার কামরায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল কি ? না ; বাকি রাত্রিটুকু শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অনেকবার বসিল, অনেকবার শুইল, অনেক দেব-দেবীর নাম করিল, অনেক কথা মনে করিল ; তাহার পর ভোরবেলায় তন্দ্রার ঝোঁকে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়াবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন দেখিল সদানন্দ মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে, কখন দেখিল জননী শুভদা আকুলভাবে রোদন করিতেছে, সর্ব্বশেষে বোধ হইল যেন মাধব আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, কোথায় কোন অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছে ; মালতীর তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। মালতীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই কেবল প্রাতঃসূর্য্যকিরণ খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন সমস্ত দিন সে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল না ; কিছু পূর্ব্বেই তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পর দিনও

তিনি আসিলেন না ; তাহার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সে দিনও এমনি কাটিল। পরদিন তিনি মালতীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ; মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একখানা কাগজ লইয়া লিখিতেছিলেন, বোধহয় কোথাও পত্র লিখিতেছিলেন। মালতী আড়চক্ষে ভয়ে ভয়ে দেখিল তাঁহার সমস্ত মুখ অতিশয় ম্লান, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আছে, মাথার চুলগুলা নিতান্ত রুক্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বস্ত্রের স্থানে স্থানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে, মালতী আপনা আপনি শিহরিয়া উঠিল ; তাহার বোধ হইল যেন নিতান্ত গর্হিত অপরাধে তাহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবু অর্দ্ধলিখিত কাগজখানা পার্শ্বে রাখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে কি ?

মালতী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হয়েছে।

আমি আজ বজরা খুলে দেব। পরপারে কলকাতা—তোমার যেখানে ইচ্ছা চ'লে যেতে পার।

কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষে জল আসিল ; কোন কথা কহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পার্শ্বে কাগজখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, এই পত্রখানা নিয়ে সন্ধান করে তাঁর নিকট যাও, তিনি তোমার কোনরূপ উপায় করে দেবেন।

টপ্ করিয়া একফোঁটা জল মালতীর চক্ষু হইতে পদতলে কার্পেটের উপর পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুও বোধহয় তাহা দেখিতে পাইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার টাকা কড়ি বোধ হয় কিছুই নাই ?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা আমি জানতাম। এই নাও, বলিয়া একটা মনিব্যাগ উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এতে যা আছে, কোনরূপ উপায় না হলেও এক বৎসর এ হতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলবে, তার পর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যা হয় করো। আর একফোঁটা জল কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িল।

সেদিন উন্মত্ত ছিলাম তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কার পাপে এমন ঘট্‌ল? কিন্তু এখন জ্ঞান হয়েছে, এখন দেখছি আমারই পাপের এই ফল—তুমি নির্দ্দোষ! আমার জয়াকে আমি মেরে ফেলেছি।

কপালের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম জমা হইতেছিল, তিনি হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ঢের হয়েছে—আর পাপ করব না; কিছুদিন সৎপথে থেকে দেখি যদি সুখ পাই।

মালতী দাঁড়াইয়া রহিল, সুরেন্দ্রবাবু পত্রখানা শেষ করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে মুড়িয়া খামে পুরিয়া শিরোনামা দিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও। শ্যামবাজারে সন্ধান করে নিও, বোধহয় এতে উপকার হবে।

কম্পিত হস্তে মালতী পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, টাকা নাও।

সে তাহাও উঠাইল; দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্রবাবুর ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল; বলিলেন, ধর্ম্মপথে থেকো—

মালতী আর একপদ অগ্রসর হইল; এবার সুরেন্দ্রনাথের গলা কাঁপিল—মালতী, সেদিনকার কথা বিস্মিত হয়ো—

মালতী দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিল, দ্বার অর্দ্ধ উন্মোচিত হইল,

সুরেন্দ্রনাথের গলা আরো কম্পিত হইল—অসময়ে, কষ্টে পড়লে আমাকে স্মরণ করো—

মালতী বাহিরে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল ; ডাকিলেন, মালতী !

মালতী সেইখানে দাঁড়াইল।

আবার ডাকিলেন, মালতী !

সে এবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কপাটে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু মুছিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জয়ার শোক এখনও ভুলি নাই—

মালতী দ্বার ছাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল।

মালতী, কি নিয়ে সংসারে থাকব ? সুরেন্দ্রনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে আর বাঁচব না। এইবার নিচে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মালতী কাছে আসিয়া বসিল, আপনার ক্রোড়ের উপর মাথা তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি যাব না।

তখন দুই জনেই বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন ; মালতী পুনর্ব্বার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিতই ছিল ; সেই ভাবেই ভগ্নস্বরে বলিলেন, সে দিন তুমি কি বলেছিলে মনে আছে ?

কি ?

চির দাসী !

তাই।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হরিচরণ !

ছাদের উপর হইতে হরিচরণ মাঝি বলিল, আজ্ঞে।

বজরা এখনি খুলে দাও।

এখনি ?

এখনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতক্ষণ বজরাখানা দেখা গেল, সদানন্দ গীত বন্ধ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মনটা ভাল ছিল না, নিদ্রাও ভাল হইল না। প্রাতঃকালে শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, আমার এখানে খেলে হয় না ?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, কেন হবে না ?

আমি তাই মনে কচ্চি ; আমার কেউ নেই, দুবেলা এখানেই দুটি খাব।

শুভদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ ত।

পিসীমার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কতক জমি-জমা আছে, সেগুলা আমিই পেয়েছি, দু-এক দিনের মধ্যেই সেখানে গিয়ে আমাকে সব দেখে শুনে নিতে হবে।

শুভদা বলিল, তা ত নিশ্চয় ; না হলে কে আর দেখবে ?

তাই মনে করেছি যে আমার ধানের গোলাটা এখানেই রাখব, না হলে চুরি যেতে পারে।

শুভদা ভিতরের কথা বুঝিল না। বলিল, এতদিন ত চুরি যায় নি।

না যাক্ কিন্তু এখন ত যেতে পারে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ইহার দুই একদিনের মধ্যেই সদানন্দর ধানের গোলা, কলাইয়ের

মরাই, আলুর বোঝা, নারিকেল ডাঁই, গুড়ের জালা সমস্ত একে একে সরিয়া আসিয়া মুখুয্যে পরিবারে স্থান গ্রহণ করিল।

দেখিয়া শুনিয়া শুভদা বলিল, সদানন্দ, লোকে কি বলবে ?

সদানন্দ হাসিয়া উত্তর দিল, জিনিস আমার, লোকের নয়। আমি এখানে খাই, এখানে থাকি, আমার জিনিস-পত্রও এখানে থাকবে।

বাস্তবিক পাড়ার পাঁচজনও পাঁচরকম কথা কহিতে লাগিল, কেহ বলিল, হারাণের বৌ সদাপাগলাকে যাদু করিয়াছে, কেহ কহিল, সদানন্দ একেবারে পাগলা হইয়া গিয়াছে, কেহবা এমন কথা রটাইল যে ছলনার সহিত সদার বিবাহ হইতেছে। সদানন্দ একথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল ; যে সম্মুখে একথা উত্থাপন করিল তাহাকে হাসিমুখে একটা রামপ্রসাদী গান শুনাইয়া দিল, কাহাকে বা রসিকতা করিয়া বলিল, আমি মরিলে তোমার নামে দুবিঘা জমি লিখিয়া দিয়া যাইব, কাহাকে বা ঈষৎ গম্ভীর-ভাবে বলিল, পাগলা মানুষে পাগলামি করে সেজন্য তোমরা ভাবিও না। ক্রমশঃ লোকে মুখ বন্ধ করিতে লাগিল, তবে যাহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র তাহারা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একথা শুনিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন।

বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া সদানন্দ দুঃখিতভাবে বলিল, যা হবার তা হয়েছে, এখন পিসীমার শ্বশুরবাটী হতে ফিরে এসে ধানের গোলাটা আপনার বাটীতে রেখে যাব।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওহে সদানন্দ, তোমার পিতাও আমাকে মান্য করে চলতেন।

আমিও কোনরূপ অমান্য করি নাই।

তবে এমন কথা বললে কেন ?

সদানন্দ অপ্রতিভ ভাবে কহিল, আমার সব সময়ে মতিস্থির থাকে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আরো রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তুমি উৎসন্ন যাচ্ছ।

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বলিল, আপনারা একটু চেষ্টা করলে না যেতেও পারতাম।

তুমি আমার সামনে হতে দূর হও।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সদানন্দ বাহিরে আসিয়া খুব একগাল হাসিয়া লইল, তাহার পর গলা ছাড়িয়া রামপ্রসাদী ধরিল।

নিকটে কাঙ্গালীচরণ মাথায় পটলের বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছিল, সে চোখে হাসি, মুখে গান দেখিয়া বলিল, কি দাদাঠাকুর, এত আমোদ কিসের ?

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, খুব খেয়েচি।

সে বলিল, বটে!

তখন সদানন্দ আজকাল পটলের দর জিজ্ঞাসা করিয়া, আর একবার হাসিয়া পূর্ব্বত্যক্ত গানটার সুর গলার মধ্যে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া মনের আনন্দে পথ বাহিয়া চলিল, কাঙ্গালীচরণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এখন একটা কথা আছে। কবি বলিয়াছেন, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; সাংসারিক অস্তিত্ব ইহার বড় একটা নাই। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ হারাণচন্দ্রের যাহা পার্থিব সুখের শেষ সীমা, শুভদা তাহা তেমন উপ-ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। হারাণচন্দ্র দুবেলা পরিতোষে আহার করিতে পান, চাহিলেই দুই-চারি আনা পয়সা স্ত্রীর নিকট কর্জ্জ করিতে পারেন, তাহা পরিশোধ করিবার বালাই মাত্র নাই, বাজারের ভিতর

দিয়া এখন উন্নত মস্তকে গমনাগমন করেন, কোন শ্যালকের নিকট একটি পয়সা মাত্র কর্জ্জ নাই, আড্ডাধারী তাঁহার পূর্ব্বপদ সসম্মানে ফিরাইয়া দিয়াছে; আর চাই কি? তবে যেটুকু বাকি আছে, হারাণচন্দ্র ভাবেন, সদানন্দ আর একটু ক্ষেপিলেই তাহা সমাধান করিয়া ফেলিবেন। গুলির দোকানটা তখন নিজেই কিনিয়া লইবেন আর কাত্যায়নী ছোটলোক বেটীর গর্ব্ব রীতিমত খর্ব্ব করিবেন। তাহার এক বৎসরের খোরাক ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে আগাম ফেলিয়া দিয়া বলিবেন, ছোটলোক বেটী! আমাকে হেয় করিস্? পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, তা তুই কোন ছার। আর ভগবান নন্দী; তার বাটীর সম্মুখে যদি আড্ডাঘর না বসাই ত আমার নাম হারাণ নয়। হারাণচন্দ্র এখন গুন্ গুন্ স্বরে গলার সুর লইয়া সমস্ত বামুনপাড়াটা ঘুরিয়া বেড়ান।

কিন্তু শুভদা? তাহার কি এক ভাবনা? ভগবান জানেন স্বামী-সুখ সে একদিনের জন্যও পায় নাই; অন্ততঃ তাহার মনে পড়ে না—সে স্বামীর মুখে অন্ন-ব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আসে কিন্তু কে তাহা দেখিবে? দেখিবার একজন ছিল; বুঝিবার একজন ছিল কিন্তু সে পূর্ব্বেই গত হইয়াছে! শুধু ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে শুভদা এই সুখেই, সাংসারিক কাহিনী খতম করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু ছলনা দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপায় কি করিয়া হইবে? যে মরিয়াছে সে বাঁচিয়াছে, কিন্তু মাধবের মনে যে কি আছে, শুভদা সে তত্ত্ব কিছুতেই নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল চিকিৎসার অনেক সুযোগ হইয়াছে, যথাসাধ্য চিকিৎসাও হইতেছে কিন্তু ফল যে কিছু হইতেছে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শুভদা একথা ভাবিয়া কপালে করাঘাত করে, ললনার কথা মনে করিয়া

আকুলভাবে আপনা আপনি রোদন করে, আর তাহার নিকট যাইবার কামনা করে, আবার জল আনে, রন্ধন করে ; সকলকে খাওয়ায় পরায়—এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া সদানন্দ শুভদার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, ছলনা বড় হয়েছে।

শুভদা মলিন মুখে বলিল, হাঁ।

আর রাখা যায় না, ভালও দেখায় না।

শুভদা বলিল, মা দুর্গাই জানেন।

সদানন্দ একটু হাসিল ; বলিল, মা দুর্গা ত আর বিবাহ দিয়ে যাবেন না ?

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

হরমোহনবাবুর ছেলে সারদার সঙ্গে বিবাহ দিলে হয় না ?

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না ; বলিল, সারদার সঙ্গে ?

হাঁ।

তা সম্ভব কি ?

অসম্ভবই বা কিসে ?

কি জানি ! ও কথাটা শুভদা সম্পূর্ণ হতাশভাবেই বলিল।

পাগলা সদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটু হাসিয়া লইল ; তাহার পর বলিল, এ বিষয় সারদার নিকট একদিন বলেছিলাম ; তার অমত নাই।

শুভদার মুখে আগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল কিন্তু তখনই তাহা মিলাইয়া গেল ; বলিল, কিন্তু তার পিতা ? তাঁর কি মত হবে ?

না হবে কেন ?

কেন হইবে না তাহা শুভদা বুঝিত, ছেলের ইচ্ছা সত্ত্বেও কেন যে

বাপের ইচ্ছা হইবে না তাহাও জানিত, কিন্তু খুলিয়া বলিতে পারিল না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কে তাহার পিতার মত করিতে যাইবে? কিন্তু তাহাও বলিল না শুধু মৌন মুখে কাতর নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাগল সে মৌনভাষাও বুঝিল; বলিল, তাহার পিতার মত আমাদেরই চেষ্টা করে করতে হবে। কারণ বিবাহ ত দিতেই হবে?

শুভদা ভয়ে ভয়ে, আশায় নিরাশায়, অস্ফুটে বলিল, হবে কি?

নিশ্চয় হবে।

কেমন করে জানলে?

পাগল আবার একটু হাসিল; বলিল, আমি তা জানি। আপনি ভাব্‌বেন না, এ মত আমি নিশ্চয় করাব।

বৃদ্ধ হরমোহনের কিরূপে মত করিতে হইবে সদানন্দ তাহা বিশেষ বিদিত ছিল, মত নিশ্চয় হইবে তাহাও জানিত।

শুভদা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দুধ আনিতে গেল; কিন্তু দুধের বাটি হাতে লইয়া অসাবধানে তাহাতে বড় এক ফোঁটা চোখের জল মিশাইয়া ফেলিল। অপ্রতিভভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, সদানন্দ, বস, ও-ঘর থেকে দুধটা বদলে নিয়ে আসি।

ও-ঘরে আসিয়া, দুগ্ধের কড়ায় হাত রাখিয়া শুভদা আরো একটু কাঁদিয়া লইল, সাবধান হইয়া আরো দুই-চারিটা বড় বড় ফোঁটা মৃত্তিকার উপর ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল। শুভদা কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্ভেদী রক্তবিন্দু নহে; বরং অসম্ভব আনন্দাশ্রু; ললনার শোকের এক ফোঁটা জল; স্বামীর বেদনার একবিন্দু বারি!

আহার সমাপন করিয়া সদানন্দ মাঠপানে চলিল। সেখানে তাহার ক্ষেত আছে, কৃষাণ কাজ করে, গরু বাছুর চরিয়া বেড়ায়—সেখানে

সদানন্দ আমের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, একটা অশ্বত্থ মূলে বসিয়া দুই-চারিটা কালীনাম করিল, দুই-চারি ছিলিম তামাক পোড়াইল, তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া হরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরমোহন তখন নিদ্রান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, কলিকার তাওয়াটা তখনও তত উত্তপ্ত হয় নাই, একটু একটু ধূম নির্গত হইতে-ছিল মাত্র।

বৃদ্ধ, সদানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হে অনেক দিন যে তোমাকে দেখি নাই?

সদানন্দ বলিল, অনেক দিন কাশীতে ছিলাম।

তা শুনেছিলাম! তোমার পিসীমাতার কাশীপ্রাপ্তি হয়েছে তাও শুনেছি। এলে কবে? ব'স।

সদানন্দ বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে নিকটেই স্থান গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিল। সদানন্দ মুখবন্ধের ধার ধারে না, মিথ্যা আড়ম্বরের ঘটা তাহার ভাল লাগে না, বসিয়াই বলিল, মশায়ের নিকট বিবাহের ঘটক হয়ে এসেছি।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, কার?

আপনার পুত্রের।

বৃদ্ধ এইবার গম্ভীর হইলেন। বিষয়ী লোক সাংসারিক কথাবার্ত্তার সময় হাসি-তামাসাগুলোকে অনেক দূরে বিদায় দিয়া আসেন। হরমোহনের নিকট তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা একটা গুরুতর বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে। এতাবৎ এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে এরূপ জটিল দেনা-পাওনার চুক্তি তর্কে

রীতিমত বুদ্ধি পরিচালনা না করিতে পারিলে কিছুতেই একটা ন্যায্য মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না, এবং পলিতমুণ্ড, মুণ্ডিতশ্মশ্রু ব্যক্তি ভিন্ন যে ঘটকালির কথা অপর কাহারও মুখেও আসিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এখন উক্তরূপ গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একজন বালকের মুখে শুনিয়া বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতে তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে সদানন্দ আরো একটু অধিক বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছে, এবং এখন তাহার ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া বিলক্ষণ রুক্ষভাবে এবং যথারীতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কার বিবাহ? সারদার?

আজ্ঞে হাঁ!

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বাটীর ভিতর পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, ঐ দিকে বোধ হয় সারদা আছে যাও।

তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া একথার অর্থ সদানন্দ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, সারদার সহিত আমার প্রয়োজন নাই, আপনার নিকটেই এসেছি।

বৃদ্ধ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নিকট?

কেন?

এই যে বললাম—আপনার পুত্রের সম্বন্ধ করতে। সারদার কি বিবাহ দেবেন না?

দেব—কিন্তু সে কথা কেন?

প্রয়োজন না থাকলেই কি এসেছি?

তোমার প্রয়োজন? আমার সহিত?

আজ্ঞে হাঁ।

কিন্তু তোমার সহিত সে সব কথা হতে পারে না।

সদানন্দ বুঝিল যে জগতের এ শ্রেণীর লোকের নিকট, মুখে একবিন্দু হাসির চিহ্নমাত্র থাকিলেও সাংসারিক কোনরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না; মুখখানা তেলো-হাঁড়ির মত না করিতে পারিলে, সে যে দেনা-পাওনা, টাকাকড়ির কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারে তাহা এ সম্প্রদায়ের মনুষ্য ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তখন সদানন্দ চেষ্টা করিয়া যতখানি পারিল ততখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, খুব হ'তে পারে। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হয়েছে, সেই অবধি আমিই তাঁর সমস্ত বিষয়-আশয় দেখে এসেছি। সাংসারিক কথাবার্ত্তা আমাদিকেই কইতে হয়; বিবাহের সম্বন্ধ করতে এসে দেনা-পাওনা মীমাংসা করতে হয় তা জানি এবং আশা করি সে বিষয় আপনি যতটা বুঝবেন আমিও প্রায় ততটাই বুঝব।

বৃদ্ধ হরমোহনের এই প্রথম বোধ হইল যে ইহা ঠিক পাগলের মত বলা হয় নাই। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অবশ্য দেনা-পাওনার মীমাংসা ত একটা করাই চাই।

সদানন্দ হাসি চাপিতে পারে না, তাই আবার একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পূর্ব্বেই মশায়কে নিবেদন করেছি যে সে সব আমার সহিত হ'লে বিশেষ ক্ষতি হবে না; তার কোনরূপ একটা মীমাংসা করতে এসেছি।

হরমোহন একটু নরম হইলেন। বলিলেন, কার কন্যা? কোথায়?

এই গ্রামেই। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা।

হারাণের?

আজ্ঞে হাঁ।

সে কি দেবে?

আপনি যা চাইবেন তাই।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন, মেয়েটি দেখতে শুনতে কেমন?

আপনি তাকে দেখেছেন কিন্তু বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই; যা হোক মেয়েটি দেখতে শুনতে আমার বিবেচনায় মন্দ নয়। আপনার পুত্র তাকে দেখেছে—বিবাহ করতেও অনিচ্ছুক নয়।

বৃদ্ধ এবার একটু হাসিল। বলিল, তা হলেই হল। আর আমাদের গৃহস্থ পরিবারে মোমের পুতুলেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই; দেখতে শুনতে নিতান্ত মন্দ না হয় এবং কাজ-কর্ম্ম করতে পারে, এই হলেই হল।

সদানন্দ বলিল, তা পারবে।

কিন্তু হারাণ কি দিতে পারবে? তার অবস্থা ত এখন ভাল নয়।

না, অবস্থা ভাল নয়! তাই বুঝে আপনি যা আদেশ করবেন তাই দেবেন।

বৃদ্ধ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন উপরোক্ত কথাটা না বলিলেই ভাল করিতেন; কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিশালী হরমোহন তাহা সহজেই শোধরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা কি জান বাপু, মেয়ের বিবাহে কিছু খরচ আছেই।

অবশ্য।

তখন হরমোহন অভ্যাসমত অধরের ক্ষীণহাসিটুকু বিদায় দিয়া পাথরের মানুষটি সাজিয়া বলিলেন, এক সহস্র নগদ মুদ্রার কম সারদার বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

সদানন্দ সহাস্যে বলিল, তাই হবে।

সদানন্দর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ত নিজের উপরই চটিয়া গেলেন।

আপনাকে একটি অতিশয় বৃহদাকার গর্দ্দভ বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিলেন ; কেন দেড় সহস্রের কথা কহিলেন না এ আপশোষ তাঁহার হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে তখন আর ফিরাইতে পারা যায় না, যাহা হোক মন্দের যতটা ভাল হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, অবশ্য মেয়েকে গয়না দিতেই হবে।

হবেই।

দান সামগ্রী রীতিমত আছেই।

আছেই।

তবে আমারও অমত নাই।

তবে একটা দিন স্থির করে ফেলুন।

বৃদ্ধ একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, অবশ্য এ বিবাহ আপনা-আপনির মধ্যেই, আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলা সব পালন করে চলতে হবে।

সদানন্দ একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, নিয়ম আবার কি ?

নিয়ম এমন কিছুই নয় তবে লেখাপড়া একটা প্রয়োজন।

বেশ তাই হোক।

কিন্তু কার সঙ্গে হবে ?

আমারই সঙ্গে হোক।

কবে ?

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, একমাস পরে।

বৃদ্ধ সম্মত হইলেন।

তখন সদানন্দ বলিল, আমার একটি অনুরোধ আছে।

কি বাপু ?

এ দেনা-পাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনতে পায়।

কেন ?

একটু কারণ আছে।

হরমোহন বিষয়ী লোক; সদানন্দর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, নিঃশব্দে দান করতে চাও ?

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া, সে নিঃস্বার্থ দয়া দেখিয়া হরমোহনেরও সেই সময়ের জন্য লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি রীতিমত বিষয়ী লোক, এভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিলেন না। একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, বাপু, আমাদের বয়েস হয়েছে, এজন্য চক্ষুলজ্জাও ততটা নাই, না হলে হারাণের অবস্থা আমি বিশেষরূপেই জানি। যাহোক তুমি যখন নিঃশব্দে দান কর্‌তে পারছ তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করতে পারব। সেজন্য তুমি চিন্তা করো না।

সদানন্দ প্রফুল্ল মুখে, নমস্কার করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুভদা শুনিল, হারাণবাবু শুনিলেন, ছলনাও শুনিল যে তাহার সহিত সারদার বিবাহ হইতেছে। এ বিবাহ সদানন্দ ঘটাইয়াছে। শুনিয়া রাসমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে সদানন্দ পূর্ব্ব জন্মে শুভদার পুত্র ছিল। সদানন্দর সমক্ষে একথা বলা হইয়াছিল, সে একথা নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইল, অতঃপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

নানা গোলযোগে পড়িয়া তাহার এ পর্য্যন্ত পিসীমাতার সম্পত্তি দেখিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন সময় পাইয়া একথা সে শুভদাকে জ্ঞাত করিল, শুভদা তাহাতে সম্মত হইল; তখন পোঁটলা-পুঁটলি

বাঁধিয়া কিছু দিবসের জন্ম শ্রীমান্ সদানন্দ বিদেশযাত্রা করিল। শুভদার সংসার এখন তাহার সংসার হইয়াছে; সুতরাং ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে ভুলিল না এবং আরো, বিবাহের অপরাপর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্ম শুভদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সদানন্দ মৃত পিসীমাতার সমস্ত জমি-জমা বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইল,তাহার পর একজন মুরব্বি স্থির করিয়া এক কথায় তাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধ মাস কালের মধ্যেই হলুদপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হরমোহনের সহিত লেখা-পড়া করিল, গহনা গড়াইল, জিনিসপত্র আনাইল, বিবাহের দিন স্থির করিল, তাহার পর সময় করিয়া সারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এতদিন পর্য্যন্ত নিভৃতে তাহার সহিত দুটো কথা কহিবার সময় হইয়া উঠে নাই। আজ অনেক দিনের পরে দুজনেই আপোষে দুটো কথা কহিতে চাহিল, তাই হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে একস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

উপবিষ্ট হইয়া সারদাচরণ বলিল, সদানন্দ, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

কতক কতক পড়ে বৈ কি।

মনে পড়ে যখন আমি একজনকে বড় ভালবাসতাম, যখন দিবারাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবতাম, তোমার কাছে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি বলতাম, অভিমান হ'লে কত কাঁদতাম, আর তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে —না হয় বিদ্রূপ করতে, সে সব কথা তোমার মনে পড়ে সদানন্দ?

তা আর পড়ে না? সে ত সেদিনকার কথা; বোধহয় সাত-আট বৎসরের অধিক হবে না—কিন্তু বিদ্রূপ ত কখন করি নাই।

আমার বোধ হ'ত যেন তুমি বিদ্রূপ করতে। যা হোক, তার পর যেদিন সে, আমার সব আশা ধূলিসাৎ করে দিল, অভিমানভরে দুজনেই

কথা বন্ধ করে চিরবিদায় নিলাম; সেদিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার কাছে বসে কাঁদলাম, সে কথা তোমার মনে আছে ভাই ?

আছে।

সদানন্দ কিছু অন্যমনস্ক হইল। সারদা কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া অদূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ঐখানে সে মরেছে।

সদানন্দ সে কথা যেন শুনিতে পাইল না, আপন মনে গঙ্গার একখানা নৌকা শাদা পালভরে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সারদা আবার বলিল, ঐখানে ললনা ডুবে মরেছে।

একবার সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোনখানে ?

ঐখানে।

কেমন করে জানলে ?

ঐখানে তার পরিহিত বস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে চল কাপড়খানা একবার দেখে আসি।

সারদা অল্প হাসিল; বলিল, কাপড়খানা কি এখনো ঐখানে আছে ?

তবে চল স্থানটা দেখে আসি।

দুজনে তখন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ জল লইয়া চোখমুখ ধুইল, তাহার পর পুনর্ব্বার যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

সদানন্দ, আমার বড় অনুতাপ হয়।

কেন ?

সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।

কেন ?

জগদীশ্বর জানেন তার আয়ু শেষ হয়েছিল কি না, কিন্তু আমার বোধ হয় আমি বিবাহ করলে সে হয়ত এখনও বেঁচে থাকত।

সদানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, যে মরেছে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তুমি কি করবে?

তা জানি। তবুও যদি তার কথা রাখতাম, যদি বিবাহ করতাম!

সদানন্দ হাসিল। বলিল, জাত যেত যে।

সারদাচরণ তাহা ভাবিল; বলিল, তা যেত।

তবে আর তুমি কি করবে?

সারদার চোখে জল আসিল। বলিল, কি আর করব, কিন্তু এত অনুতাপ হ'ত না।

সদানন্দ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ক্রমশঃ সয়ে যাবে।

আহা, যদি তার শেষ অনুরোধটা রক্ষা করতে পারতাম!

কি অনুরোধ?

বলেছিল, একঘর দরিদ্রের জাত বাঁচাও— ছলনাকে বিবাহ কর।

সদানন্দ তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, ছলনাকে কি বিবাহ করবে না?

করব, কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা হ'ল কি?

কেন হ'ল না?

প্রকারান্তরে হ'ল বটে, কিন্তু—আচ্ছা সদানন্দ, বাবাকে তুমি কি করে সম্মত করালে?

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বলিল, বললাম যে তোমার বিবাহ করতে ইচ্ছা আছে।

শুধু এই?

আবার কি?

আমি কি বাবাকে চিনি না?

সদানন্দ আবার হাসিল; বলিল, তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

জিজ্ঞাসা করছি যে কত টাকা দিতে হবে ?

সে কথা শুনে তোমার লাভ নাই।

সদানন্দ, এ যে পাপের ধন !

আশীর্ব্বাদ করব যেন তোমার জীবন চিরসুখে কাটে।

সময় হ'লে আমি ফিরিয়ে দেব।

দিও। বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া আসিয়া যেস্থানে ললনার বস্ত্র পড়িয়াছিল সে স্থানের মাটি তুলিতে লাগিল।

সারদা বিস্মিত হইয়া বলিল, ওকি কর! সন্ধ্যাবেলা মাটি তোল কেন ?

সদানন্দ খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাগলামি করছি।

বাস্তবিক বলিতে কি, সারদাচরণ তাহার কথার সহিত কাজের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইল না; তথাপি বলিল, পাগলামি করছ তা ত বলি নাই।

তুমি বলবে কেন, আমি বলছি।

না না সত্য বল মাটি নিয়ে কি করবে ?

আমি আজকাল শিবপূজা করি; বাড়িতে গঙ্গামাটি নাই তাই নিয়ে যাচ্ছি।

সারদাচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ মাটি লইয়া একটা তাল পাকাইল, তাহার পর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া সারদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চল সারদা বাড়ি যাই।

তুমি ওসব কি কর্‌লে ?

তা ত চোখেই দেখলে।

কই শিবপূজার মাটি নিলে না ?

না। আর শিবপূজা করব না।

কেন ?

আর একদিন বল্‌ব।

তখন দুইজনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া সদানন্দ সে রাত্রের মত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে আহার করিবার জন্য ছলনা, পিসীমা ক্রমে ক্রমে ডাকিতে আসিলেন কিন্তু সে দ্বার খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, আজ তাহার বড় শরীর খারাপ হইয়াছে। শুভদা দেখিতে আসিল, কিন্তু তখন সদানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া সে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইলে সে আবার উঠিল, মাঠে গেল, আহার করিতে আসিল, হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, নিত্যকর্ম্ম প্রতিদিন যাহা করে তাহাই করিতে লাগিল; কিন্তু কেহ বুঝিল না যে সে প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে; কাল যেমন ছিল, আজ ঠিক তেমনটি আর নাই। ক্রমে ১৬ই আষাঢ় ছলনার বিবাহের দিন আসিল। আজ সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মনেই উৎসাহ; সদানন্দর বসিবার অবকাশ নাই, হারাণ মুখুয্যের চিৎকারের শেষ নাই, পিসীমার চক্ষুজলের অর্গল নাই—বাটীতে যে আসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিয়া জানাইয়াছেন যে এমন সুখের দিনেও ললনার জন্য তাঁহার মনে একতিল সুখ নাই—বোধ হয় অনেকেই তাঁহার সহিত এ ব্যথা বুঝিতেছে; কেবল শুভদা আজ বড শান্ত, বড় ধীর।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অনেক বাদ্য বাজিল, অনেক লোক জমা হইল—তাহার পর শুভক্ষণে শুভলগ্নে ছলনাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

আজ গ্রামময়, কৃপণ হরমোহনের সুখ্যাতির একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; শত্রুতেও মনে মনে স্বীকার করিল যে, হ্যাঁ মনটা দরাজ বটে!

মুখের সম্মুখে কেহ তাঁহার গুণগান করিলে, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধ হরমোহন বলেন, কি আর করি বল, একটি বই ছেলে নয়, তার ওখানে বিবাহ করতে ইচ্ছা—আমি আর তাতে অমত কেন কর্‌ব? আর গ্রামের মধ্যে আমরাই ওদের পালটি ঘর—প্রতিবাসীকে একটু দেখতেও হয়। সারদাচরণ এ কথা শুনিয়া অলক্ষে ভ্রূ কুঞ্চিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক কাজ ছিল, অনেক কষ্টে তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছে। এখন আরাম করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে বেশ লাগে; কিন্তু দুই-চারি দিন পরে সে আরামটা তেমন করিয়া উপভোগ করিতে পারা যায় না। নিতান্ত আলস্যভাবে নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া থাকিতেও কেমন ব্যাজার বোধ হয়। ছলনাময়ীর বিবাহ দিয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া হরমোহনকে বেশ দুপয়সা ঘুষ দিয়া হত্যাপরাধে মৃত আসামীর খালাস পাওয়ার মত, বিছানায় পড়িয়া মনে মনে আনন্দে পাশ-বালিশ জড়াইয়া, এ-পাশ ও-পাশ করিয়া গড়াইয়া সদানন্দ দুই-চারি দিন নির্ব্বিবাদে কাটাইয়া দিল, তাহার পর বোধ হইতে লাগিল যে শয্যাটা একটু গরম, বালিশগুলা একটু শক্ত হইয়াছে, ঘরটার ভিতর একটু অধিকমাত্রায় অন্ধকার ঢুকিয়াছে, সদানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমস্ত দিন ধরিয়া হইতেছিল তাহা তখনও শেষ হয় নাই; কাল কাল মেঘগুলা ছোটখাট বাতাসে দুই-চারি পা করিয়া মাঝে মাঝে সরিয়া দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু জল বর্ষাইতে ছাড়িতেছে না —ছাড়িবেও না, সদানন্দ অন্ততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইল; তাহার পর

মাথায় ছাতা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ এ-পথ ও-পথ করিয়া কাপড় ভিজাইয়া, এক পা কাদা লইয়া হারাণচন্দ্রের বাটীর ভিতর আসিয়া খাড়া হইল। শুভদা বোধহয় রন্ধনশালায় ছিল, সদানন্দ সেদিকে গেল না ; পিসীমাতা সম্ভবতঃ পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে খোঁজও সে লইল না। পা ধুইয়া এ-দিক ও-দিক চাহিয়া যে ঘরে মাধবচন্দ্র শয়ন করিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতে মাধবচন্দ্রকে আর দেখা হয় নাই, আজ তাহার কথা একটু কহিব। ললনা চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হইয়াছে। নিতান্ত বহুদশা বিজ্ঞের মত সকল বিষয়েই সে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া মতামত প্রকাশ করে, যা তা খাইতে চাহে না ; যা তা বিষয়ে বাহানা করে না, অনেক সময় প্রায় কথাই কহে না, নিঃশব্দে দার্শনিকের মত বালিশগুলা এক করিয়া হেলান দিয়া আপন মনে বসিয়া থাকে, কেহ তাহার নিকট আসুক আর না আসুক সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। আজও সেইরূপ বসিয়াছিল ; সদানন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সদাদাদা, তুমি আর আমার কাছে আস না কেন ?

আমার কত কাজ ছিল ভাই।

সব হ'য়ে গেছে ?

হাঁ।

ছোটদিদি কবে ফিরে আস্‌বে ?

আর তিন-চার দিন পরে।

দেখ সদাদাদা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলা হয় না—

কেন ?

তোমাকে কখন একলা পাই না, তাই হয় না।

সদানন্দ নিকটে বসিল ; বলিল, একলা কেন মাধু ?

চুপি চুপি তোমাকে বল্‌তে দিদি বলে গিয়েছিল।

কে মাধু ?

দিদি ; বড়দিদি যে-রাত্তিরে চলে গেল—তখন তুমি এখানে ছিলে না কিনা তাই, তুমি ফিরে এলে তোমাকে বল্‌তে বলে গিয়েছিল যে, দিদি চলে গেছে।

সদানন্দ আরো একটু কাছে আসিয়া, তাহার অঙ্গে হাত দিয়া বলিল, কেন গেল মাধু ? কেউ গাল্যাগালি দিয়েছিল ?

কেউ না।

তবে কেন গেল ?

আমিও যাব।

ছিঃ—

মাধব একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, আর কেউ জানে না। কেবল আমি জানি আর দিদি জানে। সে আগে গেছে—আমার জন্যে সব ঠিক ক'রে আমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে দুজনে খুব সুখে থাক্‌ব। মাধবচন্দ্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত প্রফুল্ল করিয়া আবার একটু হাসিল, তাহার পর ফিরিয়া বলিল, দিদি এসে নিয়ে যাবে।

সদানন্দ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, কবে ?

যবে আমার সময় হবে।

মাধব, এসব কথা তোমাকে কে শেখালে ?

বড়দিদি।

সে তোমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল ?

হাঁ—

আর যদি না নিয়ে যায় ?

কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে।

যদি না নিয়ে যায়, তা হলে তুমি একা যেতে পারবে কি?

মাধব একটু বিমর্ষ হইল, একটু ভাবিয়া দেখিল; তাহার পর বলিল, কি জানি।

সদানন্দও চুপ করিয়া রহিল। মাধব আবার কহিল, সদাদাদা, সেখানে একলা যাওয়া যায় কি?

যায়। না হ'লে তোমার দিদি গেল কি ক'রে?

আমিও তবে যেতে পারব?

পারবে।

মাধব আবার একটু ভাবিল, পরে অধিক দুঃখিতভাবে কহিল, কিন্তু কেমন ক'রে যাব—আমার গায়ে আর একটুও জোর নেই। সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, সে বলিতে লাগিল, দিদি যখন যায় তখন দিদির গায়ে খুব জোর ছিল, আমি কিন্তু কেমন ক'রে যাব? এখন আমি একবার দাঁড়াতেও পারি নে—অত দূর কি যেতে পারব?

সদানন্দর চক্ষে জল আসিল; অন্ধকারে মাধব তাহা দেখিল না। সদানন্দ দেখিতে লাগিল যে মাধবের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন—তাহার পর সব ফুরাইয়া যাইবে। সে ভাবিল শুভদার কথা, সে ভাবিল ললনার কথা, সে দেখিল, সে একটু ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে, পাঁচজনকে জড়াইয়া লইয়া আর তেমন চিন্তাশূন্য আনন্দে দিনাতিবাহিত হয় না, কালীনামগুলা আর তেমন করিয়া গাওয়া হয় না, তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তেমন করিয়া আনন্দ করিতে পারে না—সে সুখী ছিল অসুখী হইয়াছে, বিরাগী ছিল সংসারী হইয়াছে। চক্ষের জল মুছিয়া সদানন্দ আজ প্রথম মনে করিল যে, বাঁচিয়া থাকিয়া তেমন সুখ হয় না; যে জীবিত আছে তাহারই কষ্ট আছে, যে মরিয়াছে এ জ্বালার

সংসারে সে বাঁচিয়াছে। সে রাত্রে সদানন্দ অনেক ভাবিল ; যাইবার সময় ললনা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই সে কথা মনে পড়িল, মাধবচন্দ্র মরিতেছে একথাও স্মরণ হইল, আর শুভদা—তাহার মনে হইল যে, ললনা মরিয়া তাহার যত দুঃখকষ্ট সমস্তই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মাধবচন্দ্রের মনেও সে রাত্রে খুব সুখ ছিল না। মধ্য হইতে তাহার একটা দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিয়াছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল যে সময় হইলে ললনা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সদাদাদা একটু অন্যরূপ বলিয়াছে—তাহার শরীরে আর একটুও সামর্থ্য নাই, সে স্থলে কেমন করিয়া সে অতদূর যাইতে পারিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক রাত্রে সে নিশ্চয় করিল যে তাহার দিদি কখন মিথ্যা বলিবে না—যথাসময়ে নিশ্চয়ই আসিবে। মাধবচন্দ্র তখন অনেকটা শান্ত মনে নিদ্রা গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আরো কতদিন কাটিয়া গেল। ছলনা বাপের বাটী ফিরিয়া আসিল, পাড়ার মেয়েরা আর একবার নূতন করিয়া কন্যা জামাতা দেখিয়া গেলেন, কত হাসি কত তামাসা গড়াইয়া গেল, হরমোহন নিজে এখানে আসিয়া সকলকে মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া বেয়ান ঠাকুরাণীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, হারাণচন্দ্র কোমরে ফর্সা চাদর বাঁধিয়া বামুনপাড়ার প্রত্যেক দোকানে একবার করিয়া বসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

আজ মাধবচন্দ্রের পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শয্যার উপর ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং পার্শ্বে, শিয়রে, পদতলে পিসীমাতা, কৃষ্ণঠাকুরাণী, ছলনা প্রভৃতি বসিয়া আছে। শুভদা এখানে নাই—সে রন্ধনশালায় বসিয়া

কতক রাঁধিতেছে কতক কাঁদিতেছে, সদানন্দ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে আর হারাণচন্দ্র 'এই আসিতেছে' বলিয়া ঘণ্টা তিন হইল বাহির হইয়াছেন এখনও আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই। সকলে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন; কৃষ্ণঠাকুরাণী মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় মনে মনে সময় গুণিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার একটু পরে ডাক্তার আসিয়া পৌছিলেন; তিনি আজ ছয়-সাত দিবস হইতে নিত্য আসিতেছেন, নিত্য দেখিতেছেন, পীড়া কিছুতেই কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তাহা জানিতেন, বাঁচিবে না তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আসিবার ইচ্ছাও ছিল না কিন্তু সদানন্দর পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘরে আসিয়া ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দবাবু, আজ বেশ সাবধানে থাকবেন; ছেলেটি বোধ হয় আজ রাত্রে বাঁচবে না!

সদানন্দও তাহা জানিত।

অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, চোরের ন্যায় কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব অবগত হইলেন, তাহার পর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, এখন কেমন আছে?

কেহ কথা কহিল না। শুধু শুভদা বাহির হইয়া আসিল; খাবার থালা সম্মুখে রক্ষা করিয়া নিকটে বসিল।

হারাণ বলিলেন, মাধু এখন কেমন?

বোধহয় ভাল নয়।

ভাল নয়? একটু থামিয়া বলিলেন, আমার শরীরও ভাল নয়।

কি ভাবিয়া তিনি যে একথা বলিলেন, কি মনে করিয়া যে তিনি নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বলিতে পারি না এবং

ইহাতে সত্যাসত্য কতদূর ছিল তাহাও অবগত নহি—কিন্তু একথা শুভদার কানে প্রবেশ করিল না। হারাণচন্দ্র মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন; স্ত্রীর নিকট শারীরিক অসুস্থতার কথা কহিয়া তাহার একটা স্নেহময় প্রত্যুত্তর না পাওয়া, তাঁহার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইল যে হারাণচন্দ্র আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন। তিনি নেশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই সামান্য অপমানাঙ্কুর দুই-চারি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মস্তিষ্কের ভিতর বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দিল। হারাণচন্দ্র বিরক্তভাবে থালা ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর খাব না—শেষে কি মরে যাব? হারাণচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া আচমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নির্দ্দিষ্ট শয্যায় যথারীতি শয়ন করিলেন; মনে মনে বোধহয় স্থির করিয়া লইলেন যে তাঁহারও যথেষ্ট অসুখ হইয়াছে।

এদিকে শুভদা হাত ধুইয়া মাধবের নিকটে আসিয়া বসিল দেখিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী বলিলেন, হারাণ কোথায়?

তাঁর শরীর অসুখ হয়েছে—শুয়েছেন।

কৃষ্ণঠাকুরাণী একটু মৌন হইয়া রহিলেন; তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, মানুষের মায়া-দয়া থাকে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ত একটু থাক্‌তে হয়!

রাসমণি একথা শুনিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। কৃষ্ণঠাকুরাণী অনেক মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ হইল, মাধবের অল্প শ্বাস হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাধব কহিয়া উঠিল, বড় মাথা ধরেচে।

কৃষ্ণপিসীমাতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিল, বড় পেট কামড়াচ্চে; বড় গা বমি বমি কচ্চে।

সকলে সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যেন প্রত্যেকই প্রত্যেকের মনের কথা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করিল।

পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইল—সকলেই মৌন ম্লানমুখে শেষটার জন্ম অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কাতরভাবে মাধব বলিল, বড় তেষ্টা।

পিসীমাতা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। আগ্রহে মাধব সেটুকু সম্পূর্ণ পান করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে শ্বাস বাড়িয়া উঠিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন, কৃষ্ণঠাকুরাণী নাড়ি দেখিতে জানিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিয়া সদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এবার নিচে শোয়াতে হবে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

রাসমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি অস্ফুটে কাঁদিয়া উঠিলেন—আর দেখ কি সদানন্দ ?

ছলনা কাঁদিয়া উঠিল, কৃষ্ণপিসীমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধবেরও প্রায় অচেতন দেহ নিচে নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণ পরে মাধব আর একবার হাঁ করিল—কৃষ্ণপিসীমাতা পূর্ব্বের মত তাহাতে আর একটু জল দিলেন। মাধব যেন একটু বল পাইল—একবার চক্ষু চাহিল তাহার পর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, সদাদাদা, দিদি —এসেছে।

ছলনাময়ী নিকটে বসিয়াছিল, আজ সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই, শিহরিয়া সে জননীর আরো নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল ; রাসমণির সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ পরে, মাধবচন্দ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, মাথা

নাড়িতে লাগিল—প্রবল শ্বাস হইয়াছে ; দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী কাঁদিয়া বলিলেন, আর কেন ? সময় হয়েছে—রাসমণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—পরকালের কাজ কর—তুলসীতলা—

সকলেই তখন উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। চিৎকারশব্দে হারাণচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইতেছে—তিনিও চিৎকার করিয়া পুত্রের শরীর তুলসীতলায় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন—কাঁদিয়া ডাকিলেন, বাবা—মাধু—

সেও বোধহয় গোঁ গোঁ করিয়া একবার কহিল, বা—বা !

দশম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র হর্ম্ম্যে বিচিত্র কৌচের উপর অপূর্ব্ব সুন্দরী মালতী কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সাইড্-বোর্ডের উপর রৌপ্য শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে মালতী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যে কক্ষে মালতী বসিয়া আছে তাহা অতিরিক্ত সুসজ্জায় সজ্জিত। সমস্ত হর্ম্ম্যতল বহুমূল্য বিচিত্র কার্পেটে মণ্ডিত ; দেওয়াল নানাবিধ লতা-পাতা ফুল-ফলে বিচিত্র, তাহার উপর বহুবিধ তস্‌বির, বহুমূল্য অয়েলপেণ্টিং, অলিওগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিশেষ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আশে-পাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বেলওয়ারি কাঁচের ভিতর দিয়া লাল নীল সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্ততঃ ঠিক্‌রিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোক রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্ম্মর প্রস্তরের মেজ

এবং শ্বেত প্রস্তরের ঝরণা তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য প্রতিকৃতি সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণ-প্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে। কত রূপে যে এ পার্থিব সৌন্দর্য্য সহস্র গুণ বৃদ্ধি করিয়া সে বসিয়া আছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ নয়নে সে শোভা দেখিবার জন্য সেখানে আর কেহ ছিল না, তাই মালতী আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। পাঠ আর ছাই করিতেছে; ছত্রের পর ছত্র সরিয়া যাইতেছে, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে কিন্তু এক বর্ণও মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। সে ইতিপূর্ব্বেই বোধ হয় কাঁদিতেছিল, কেননা শুষ্ক জলের দাগ এখনও তাহার কপোলের উপর প্রতীয়মান হইতেছে। এ সুখ-ভবনে সে কেন যে কাঁদিতেছিল তাহা জানি না, কিন্তু কাঁদিতেছিল তাহা নিশ্চয়; এবং সেই কান্নাই থামাইবার জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। মালতী নিরাভরণা, মালতী সামান্য বস্ত্র পরিহিতা, মালতী কাঁদিতেছিল, মালতীর মনে সুখ নাই। পুস্তক বোর্ডের উপর বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, নিঃশব্দে কৌচের বাজুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিল। পুনর্ব্বার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, এবার তাহা রোধ করিবার প্রয়াস করিল না। কাজেই একটির পর একটি করিয়া অশ্রু কৌচের মখমল চাদরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; অত পুরু গালিচার উপর পদশব্দ হয় না কাজেই এ আগমন মালতী জানিতে পারিল না, সে যেমন কাঁদিতেছিল তেমনই কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আরো একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, মালতী!

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল; বলিল, এসো।

সুরেন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিলেন। তাহার দুটি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন, আবার কাঁদছিলে?

মালতী হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এই জন্য ইচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কেন কাঁদছিলে?

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে তাহার হাত দুটি আরো একটু টিপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃখ এই যে এত চেষ্টাতেও তোমাকে সুখী করতে পারলাম না, হৃদয়ের সহস্র কামনাতেও তোমার মন পেলাম না।

মালতী একটা উত্তর খুঁজিল কিন্তু পাইল না, আরো একটা কাজ তাহার দ্বারা হইল না। ইতিপূর্ব্বে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহাই হোক আর কাঁদিবে না, কিন্তু অশ্রুর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা যেমন পড়িতেছিল, তেমনই পড়িতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, কি করলে যে একজন সুখী হতে পারে তা মানুষে বুঝতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি না তাও বলতে পারি না। তৃপ্তির জন্য, সুখের জন্য এ ভবন এমন করে সাজালাম, এ দেবী প্রতিমা এ ভবনে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করলাম, কিন্তু সুখী হতে পারলাম কি? সুখের কথা ছেড়ে দিই—বোধ হয় আমার অসুখের মাত্রাই বৃদ্ধি হয়েছে। যাকে সুখী করতে এত করলাম তাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখলাম না, তোমাকে পেয়ে অবধি ও অধরে এক তিলের জন্যও হাসির রেখা দেখলাম না, বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত অধীর ভাবে সে অশ্রু-মলিন মুখখানি

তুলিয়া ধরিলেন, বলিলেন, মালতী, কতদিন কেটে গেল কিন্তু কিছুতেই কি তুমি প্রফুল্ল হবে না, কিছুতেই কি একবার হেসে চাইবে না ?

মালতী হাত তুলিয়া চক্ষু মুছিল।

এ সৌন্দর্য্য যে কি, এ রূপে যে কত মুগ্ধ হয়েছি তা প্রকাশ করতে পারি না। মনের সাধে সাজাব বলে কত অলঙ্কার আনলাম, কত বস্ত্র সংগ্রহ করলাম কিন্তু এক দণ্ডের তরেও তুমি পরলে না ! মালতী ! তুমি কি আমাকে দেখতে পার না ?

মালতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, তুমি যে আমাকে দেখতে পার না তা বলি না, কিন্তু আমার আরও অনেক কথা মনে হয়—তুমি আমার অপরাধ নিও না—আমার যা মনে হয়—আজ তা বলে যাই—আমার বিশ্বাস তুমি যে পন্থা অবলম্বন করেছ, নীচ স্ত্রীলোকে আত্মসুখের জন্যই সে পন্থা অবলম্বন করে থাকে এবং বস্ত্রালঙ্কার ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য ভিন্ন তাদের সুখ যে আর কিসে আছে তা জানি না, কিন্তু তোমাকে তাদের মত বোধ হয় না, সেই জন্য বুঝতেও পারি না কি করলে তুমি সুখ পাবে। যদি তা হ'ত তা হ'লে তুমি এতদিনে সুখী হ'তে, বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন ; পরে ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, মালতী ! তোমার স্বামী জীবিত আছেন কি ?

মালতী ক্রোড়ের উপর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার স্বামী জীবিত নাই।

তবে বল তোমাকে বিবাহ করলে কি সুখী হও ? বল—বল আমি তাতেও কুণ্ঠিত নই।

এইবার মালতী গড়াইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল, হাত দিয়া

তাহা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু ভুলিবার চেষ্টা করিলেন না, বুঝিলেন চক্ষের জলে তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে, তথাপি উঠাইলেন না, বরং দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইয়া গেলেন।

বহুক্ষণ হইল; তাহার পর ম্লানভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ভগবান জানেন আমার কি হয়েছে। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবেসেছি, কি ও অতুল রূপে উন্মত্ত হয়েছি তা বলতে পারি না, কিন্তু জ্ঞান কাণ্ড আমার আর নাই, ভাল মন্দ বুঝে দেখবার ক্ষমতা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে! তোমার একটি কথার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বুঝি দিতে পারি। ঈশ্বর জানেন তোমার মন পাবার জন্য মিথ্যা বলছি না, সত্যই বলছি; আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছি—যা হবার হবে—তুমি একবার বল, তোমাকে বিবাহ করলেই যদি সুখী হও তাই করব। জাত, কুল, মান, এতবড় বংশ কিছুই মনে করব না। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ থামিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, তার পর মালতী, আমাদের মত মানুষের পরিষ্কার পথ পড়ে আছে—যখন সহ্য করতে পারব না আত্মহত্যা করে নরকের পানে সোজা চলে যাব।

মালতী আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ও কথা তুমি বল না। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছিলে, লজ্জা নিবারণ করেছিলে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলে—না হ'লে এখনও বোধহয় বেঁচে থাকতাম না; আমি নীচ, কুৎসিত কিন্তু অকৃতজ্ঞ হ'তে পারব না। তোমার দয়া, তোমার স্নেহ এ জীবনে কখন ভুলব না—এ সকলের প্রতিশোধ কি আমি এইরূপে দেব?

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিসে প্রতিশোধ হয় তা ঈশ্বর জানেন; আমি জানি না। তোমাকে বলব কি, যে যন্ত্রণা, যে অন্তর্দ্দাহ আজ মাসাধিক কালের উপরও ভোগ করে আসছি; মনে দুঃখ করো না, কিন্তু বলতে লজ্জা হয় যে, এত অল্প দিনে স্ত্রীলোকের এরূপে দাস হয়ে পড়েছি; একজন—একজন—তুমি যেই হও—তুমি যেই হও—কিন্তু আমি ত স্বর্গীয় পিতৃপিতামহগণের বংশ সম্মান লুপ্ত করতে সম্মত হয়েছি।

মালতী সেইরূপ ভাঙা ভাঙা স্বরে কহিল, আমি তোমার দাসীরও দাসী যোগ্য নই—আমি কে যে আমার জন্য তুমি এতই সবে—তোমার কেশাগ্রও বিসর্জ্জন দেবে? আমি আজন্ম দুঃখী—এত করুণা এ জীবনে কখন পাই নাই। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যদি শেষ হয়, ঈশ্বর করুন যেন এই আমার শেষ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত তুমি সুখ পাচ্ছ না।

মালতী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কহিল, আমরা বড় দরিদ্র।

কিন্তু আমি ত দরিদ্র নই। আমার যা আছে, তোমারও ত তা আছে।

আমি নিজের কথা বলছি না।

তবে কার কথা? তোমার ত কেউ নাই!

ভগবান জানেন এখন আর কেউ আছে কি না, কিন্তু যখন চলে এসেছিলাম তখন সব ছিল।

সে কি? নৌকাডুবি হয়ে—

সে সব মিছে কথা; নৌকাডুবি আদতে ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ

হয় একবার মনে হইয়াছিল যে, এ সকল ছলনা না সত্য কথা? কিন্তু সে মুখে ছলনা সম্ভবে না—সে চক্ষু, সে অশ্রুজলের মধ্যেও যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাঁহার তাহা বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, মালতী!

কি?

সব সত্য?

এবার মালতী মুখ পানে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন, স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, তবে সব কথা খুলে বল।

মালতী ধীরে ধীরে তখন তাঁহার জানুর উপর মাথা রাখিয়া কখন কাঁদিয়া, কখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েছি, কিন্তু আমাদের সব ছিল। পিতা আমার যথাসাধ্য দেখে শুনে বিবাহ দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হলাম—যাঁর সহিত বিবাহ হ'ল তাঁকে বোধহয় এক বারের অধিক দেখতেও পাই নাই। আমি বাপের বাটীতে ছিলাম, সেই অবধি পাঁচ বৎসর প্রায় সেই খানেই থাকলাম। পিতা আমাদের গ্রাম হলুদপুর হ'তে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের নিকটে কর্ম্ম করতেন। সামান্যই বেতন পেতেন কিন্তু তাতেই আমাদের একরূপ দুঃখেকষ্টে চলে যেত। এই সময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমাদের বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন?

সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসীমা, আমরা দুই বোন আর একটি ছোটভাই। তার পর চুরি অপরাধে বাবার চাকুরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করে কোন দিন আমাদের আহার হ'ত, কোন দিন

হ'ত না। মা সতীলক্ষ্মী ছিলেন—চেয়ে চিন্তে যা মিল্‌ত তাতে অপরাপর সকলকে খাইয়ে মা প্রায় নিত্য উপবাসী থাকতেন; এমন এক সঙ্গে তিন দিনও—এই সময় মালতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কিন্তু এসব দিকে ফিরেও চাইতেন না। গাঁজা গুলি খেতেন, যেখানে সেখানে পড়ে থাকতেন—হয়ত বা চার-পাঁচ দিন ধরে বাড়িতেই আসতেন না।

আমার ছোটভাই মাধব প্রায় একবৎসর হ'তে পীড়ায় ভুগছিল, চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই আরোগ্য হ'তে পারছিল না, বোধহয় এত দিনে সে আর বেঁচেও নেই—এ সময় সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল।

তাহার পর মালতী কৃষ্ণঠাকুরাণীর কথা বলিল, সদানন্দর কথা বলিল, শেষে বলিল ছলনার কথা। মালতী কহিল, ছলনার বিবাহের বয়স হ'ল কিন্তু দরিদ্র বলে কেউ বিবাহ করতে চাইল না। বিবাহ না হ'লে ব্রাহ্মণের ঘরে জাত যায়—আমাদেরও জাত যায় যায় হ'ল; মা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করলেন। পিতা ফিরেও চাইতেন না, শুধু ভরসা ছিল সদানন্দ, কিন্তু তিনিও তখন দেশে ছিলেন না—কাশীতে তাঁর পিসীমাতাঁকে নিয়ে ছিলেন।

পিতার চাকুরী যাবার পর হ'তে ক্রমে ক্রমে এরূপে ছমাস কেটে গেল। পাড়া প্রতিবাসীতে আর কত সাহায্য করবে? সদাদাদা কাশী যাবার সময় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তাও ফুরিয়ে গেল—এ সময়ের কথা আর বলতে পারি না—মালতী আবার কাঁদিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথও কাঁদিলেন; কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, আর কাজ নাই—অন্য দিন বলো!

মালতী চক্ষু মুছিয়া বলিল, আজই বলি। লোকে আমাকে সুন্দরী

বল্‌ত, আমি ভাবতাম কলকাতায় গিয়ে উপার্জ্জন করব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে এলাম, মনে করলাম তীরে তীরে কলকাতায় যাব—তা হ'লে বড় কেউ দেখতে পাবে না, কাকেও পথও জিজ্ঞাসা করতে হবে না। ঘাটে এসে দেখলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড নৌকা পাল ভরে যাচ্ছে, আমি সাঁতার জানতাম, নৌকা দেখে ভাবলাম নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে নৌকার হাল ধরে থাকব; শুনেছিলাম আমাদের দেশ হ'তে কলিকাতা অধিক দূর নয়—তবে ঠিক জানতাম না যে কতদূর। ভাবলাম রাত্রিশেষে নৌকা নিশ্চয় কলকাতায় পৌঁছবে, আমিও তখন নেমে যাব। জলে পড়লাম, সাঁতার দিয়ে কিছুদূর এলাম—এই সময়ে কাপড়খানা হাতে, পায়ে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে গেল, আমিও প্রায় ডুববার মত হলাম; কিন্তু বহু ক্লেশে অবশেষে সেখানা খুলে ফেললাম, কিন্তু হাত হতে সেটা পিছলিয়ে কোথায় সরে গেল। এই সময় নৌকাখানাও কাছে এসে পড়ল, আমার হাত পা-ও ধরে গিয়েছিল—ভবলাম আর ফিরে যেতে পারব না—তাই হালটা ধরে ফেললাম। নৌকা চলতে লাগল, আমিও সাহস করে তা ছাড়তে পারলাম না, ভয় হল, তা হ'লেই ডুবে যাব; এইরূপ বহুদূর চলে এলাম। তখন আর ফিরে যাবারও উপায় ছিল না। অবশেষে স্থির করলাম, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করতে অনেক স্ত্রীলোকেই এসে থাকে তাদের নিকট বস্ত্রও থাকে—ভিক্ষা করে একটা চেয়ে নেব—বিবস্ত্রা দেখলে স্ত্রীলোকের দয়া হবেই। তারপর সব তুমি জান।

সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, যেজন্য এত করলে এতদিনে তার কোন উপায় করেছ কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তা জানি। আর তাই ভাবছি, যে মুখ ফুটে একটা কথা বলতে পারে না সে কোন সাহসে এতটা করেছে।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

মাসে মাসে কত টাকা হ'লে তাঁদের চলে?

কুড়ি টাকা।

প্রতি মাসে সেখানে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠিয়ে দিও।

তুমি দেবে?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, বলিলেন, দেবো; আরো চাও আরো দেবো।

মালতী মনে মনে কহিল—এতদিনে তার জন্ম সার্থক হইল।

তার পরে আর একটা কাজ ক'রো—আমাকে বিবাহ করো—কেননা নরাধম হ'লেও—অত শুভ্র হৃদয়ে আমি কলঙ্কের ছাপ লাগাতে দেব না।

মালতী তাঁহার বুকের ভিতর মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, না—

কেন—না? তুমি ভাবছ আমার জাত যাবে, কিন্তু আমি এস্থানের জমিদার, আমার অনেক টাকা—যার টাকা আছে তার জাত শীঘ্র যায় না।

গোলমাল হবে।

হবে; কিন্তু তাও অধিকদিন স্থায়ী হবে না।

বংশ, কুল, মান, সম্ভ্রম?

মালতী! একদিনের জন্যও সে সকল ভুলতে দাও—জগতে এসে অনেক দ্রব্য পেয়েছি—কিন্তু সুখ কখন পাই নাই; একদিনের জন্য আমাকে যথার্থ সুখী হ'তে দাও।

কথা শুনিয়া মালতীর ভিতর পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা চাপিল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার নিকট চিরদিন থাকব।

ঈশ্বর করুন তাই হোক। তুমি চিরদিন থাকবে, কিন্তু আমি পারব কি? তুমি সংসার দেখ নাই কিন্তু আমি দেখেছি। আমি জানি আমাকে বিশ্বাস নাই। যে প্রেমে তুমি চির জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে, আমি হয়ত কোন দিন তা মাঝখানে ছিন্ন ক'রে পালিয়ে যাব। মালতী! সময় থাকতে আমাকে বেঁধে ফেল।

মালতী ভাল করিয়া সমস্ত শুনিল, অনেক দিনের পর আর একবার স্থির হইয়া ভাবিয়া লইল—তাহার পর অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, বেঁধেছি, পার এ ছিন্ন ক'রো। এর উপর আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই।

তোমার নাই কিন্তু আমার আছে।

থাকুক কিন্তু বিবাহ হ'তে পারে না।

কেন, বিধবাকে বিবাহ কি করতে নাই?

বিধবাকে বিবাহ করতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।

সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—তুমি কি তাই?

নয়-কি? নিজেই ভেবে দেখ দেখি?

ছি ছি!—ও-কথা মুখে এনো না—তোমাকে কত ভালবাসি।

সেই জন্যই মুখে আনলাম; না হ'লে হয়ত বিবাহ করতেও সম্মত হ'তাম।

মালতী!

কি?

সব কথা খুলে বলবে?

বলব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্ব্বে কেউ কখন স্পর্শও করে নাই, কিন্তু একজনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়েছিলাম।

তার পর ?

জাত যাবার ভয়ে সে বিবাহ করলে না।

সে মন-প্রাণ ফিরিয়ে নিলে কিরূপে ?

সে যেরূপে ফিরিয়ে দিল।

পারলে ?

মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, পূর্ব্বেই বলেছি, আমি বেশ্যা—বেশ্যায় সব পারে!

উঃ—সে কি সদানন্দ ?

না—আর একজন।

তবে তুমি মানুষ চিনতে পার নাই—তাকে বল নাই কেন? সে তোমাকে ভালবাসত।

সহসা মালতীর সর্ব্বাঙ্গে তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা! মালতীর মনে পড়িল, সেই বৃষ্টির দিন; সে সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে জল আনিতেছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, ভিজিয়া জ্বর হইবার ভয়ে সদানন্দর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে পড়িল সেই প্রথম তাহার নিকট অর্থ সাহায্য পাওয়া; তাহার পর নিত্য হাতে গুঁজিয়া দেওয়া; সেই কাশী যাইবার দিন; সেই বালিশের নিচে একরাশ টাকা দেওয়া,—সেই আরো কত কি! মনে পড়িল দুঃখের সময় সেই সহানুভূতি। নিমিষে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু বহিয়া পড়িবার পূর্ব্বে মালতী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কৌচের বাহুতে হেলান দিয়া চক্ষু মুছিয়া অন্য অনেক কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তার পর ?

কলকাতায় যাচ্ছিলাম।

তার পর ?

দয়া করে পায়ে স্থান দিয়েছ।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া করিয়াছিলেন, উত্তর শুনিয়া তাহা বুঝিলেন। উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, মালতী তুমি রত্ন! রত্ন কুস্থানে পেলেও গলায় পরতে হয়।

কে বললে? যে রত্ন একজন গলায় পরে, অন্যে হয়ত তা পায়ে রাখতেও ঘৃণা বোধ করে। তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও—আমি রত্ন, তাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করব।

সুরেন্দ্রনাথ অল্প হাসিলেন; বলিলেন, মালতী, আমি ভাবতাম তুমি বোকা কিন্তু তা তুমি নও—

মালতী অল্প হাসিল। দুঃখে কষ্টে আজ তাহার অধরে প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে দাসী বলিল, বাবু, অঘোরবাবুর জুড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন; অঘোরবাবু? কিন্তু এ বাগান বাড়িতে কেন?

তিনি বলে পাঠিয়েছেন বড় দরকার।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, মালতী, এখন তবে আসি।

এস; কিন্তু অঘোরবাবু কে?

পরে শুনো।

অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কোথায় বিবাহ করেছেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিলেন—কোন পরিচয় আছে নাকি?

বোধহয় কতক আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতেই হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম; কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে কিম্বা মানুষে সখ করিয়া কাঁদে, কিম্বা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটা-ফাটি কাণ্ডও বাধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শত হস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়। এ ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে; যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিত মুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু সে যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া প্রশান্তভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে তাদের বুকখানা ফাটিয়া যাক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে

ফেলিয়া দিতে পারি না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু বিসর্জ্জন ভগবান পদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্ম-বলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও ত পূর্ব্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, কবাট বন্ধ করিয়া মালতী ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কত যে কাঁদিল, তাহা বলিব না। বুঝি সে ভাবিয়া দেখিতেছিল, বাল্যকালের সে ভালবাসা আর এ ভালবাসায় কত প্রভেদ! মালতী আপনা খাইয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর গভীর কৃতজ্ঞতা মিশিয়াছে! ছাই নিজের সুখেচ্ছা! তাহার বোধ হইল তাঁহার জন্য হাসিতে হাসিতে সে নিজের প্রাণটাও দিতে পারে।

মালতী বলিতে লাগিল, প্রাণাধিক তুমি—তোমার একগাছি কেশের জন্য মরিতে পারি, তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে? শুধু আমার জন্য পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীলা, কেহ আমাকে জানে না, কেহ আমাকে চিনে না—আমার লজ্জা নাই কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎ সুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছ; সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্ম্মপীড়া অনুভব করিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল, তাহা হইবে না। এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিব না।

মালতী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিয়া যুক্তকরে কহিল, ঠাকুর তুমি জান, এ জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সে দিনে ভুলিও না। জগতে আমার আর স্থান নাই, কিন্তু যদি কখন সেদিন হয়, যদি কখন স্বামী-স্নেহ হারাইতে হয়—সেদিন তুমি আমাকে লইও—পতিতা হইলেও চরণে স্থান দিও।

সে রাত্রের মত মালতী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পরদিন হইল কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন না। সমস্ত দিন মালতী পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল, অনেক রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিয়া মালতী কিছু শঙ্কিত হইল; কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি হাসিয়া বলিলেন, মালতী, সারাদিন বুঝি পথ চেয়ে আছ?

রঞ্জিত মুখে মালতী নিরুত্তর রহিল।

কি করি বল? একদিনের জন্যও মকদ্দমা মেটে না। যার যত আছে কষ্টও তার ততখানি আছে।

মালতী বলিল, মকদ্দমা কর কেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন; বলিলেন, করি কেন? তা পরে বুঝবে। আগে আমার হও—সমস্ত বিষয় নিজের মনে করতে শেখ, তার পর বুঝবে মকদ্দমা করি কেন?

মালতী মৌন হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মালতী, সে কথা ভেবেছিলে?

কোন্ কথা?

কোন্ কথা? কালকের কথা আজই ভুলে গেলে?

ভুলি নাই; মনে আছে।

তা ত থাকবেই, কিন্তু ভেবে দেখেছিলে কি?

দেখেছি। বিবাহ কিছুতেই হয় না।

হয় না? সে আবার কি?

সে কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি।

বলেছ আমার মাথা আর মুণ্ড। বিবাহ আমি করবই।

আমি হতে দেব না। একমাসের উপর হ'ল এখানে এসেছি; যদি এতই মনে ছিল তবে পূর্ব্বে করলে না কেন? এখন সবাই জেনেছে তুমি মৃত জয়াবতীর স্থানে আর একজনকে কলকাতা হ'তে এনেছ।

সুরেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক হইলেন, বলিলেন, আমিও তা ভাবছিলাম, হোক গে—আমি—

তা হ'লে আমি বিষ খাব।

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে কথা পরে বোঝা যাবে। আপাততঃ এখন সাত দিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করব।

তবে সাত দিনের মধ্যেই আমাকে আর দেখতে পাবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, কোথায় যাবে?

যেখানে ইচ্ছা।

মরবে?

মরব না—কেন না মরতে আমি পারব না। তবে যে পথে ভেসেছিলাম আবার সেই পথেই ভেসে যাব।

তবু বন্ধন পরবে না?

না।

সেরূপ দৃঢ় স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে মালতী মিথ্যা বলিতেছে না; একটু চিন্তা করিলেন, পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি করবে? এ তোমাদের স্বধর্ম্ম! ভাল তাই হোক।

মালতী এবার আর কোন উত্তর দিল না। মৌন মুখের এ তিরস্কার

সহ্য করিয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ আর কথা কহিল না। পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছিলে?

মালতী তখন কাঁদিতেছিল—মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পাঠান হয় নাই।

কেন পাঠাও নাই?

মালতী মৌন হইয়া রহিল। এবার তিনি বুঝিলেন যে মালতী কাঁদিতেছে। বলিলেন, হাতে টাকা ছিল না?

না।

কিছুই ছিল না?

না।

এতদিন এসেছ, হাতে কিছু হয় নাই?

মালতী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজেই বেশ জানিতেন যে তাহার নিকট কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নিকটে আনিলেন, পার্শ্বে বসাইয়া স্নেহার্দ্র স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, সাধ করে এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকলে আমি কি করব বল? একখানা কাপড় পরবে না, একটা অলঙ্কার অঙ্গে তুলবে না, কি প্রয়োজন, কি ভালবাস, তা কখন মুখ ফুটে বলবে না—আমি আর কি করব বল? তাহার পর পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। এ হতে যা ইচ্ছা পাঠিয়ে দিও—বাকি যা রইল, স্বচ্ছন্দে ব্যয় ক'রো, আর মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু চেয়ে নিও, অল্প হাসিয়া বলিলেন, টাকা জমাতে শিক্ষা কর।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ভুলো না—আজ টাকা পাঠিয়ে দিও।

কেমন করে দেব ?

রেজেষ্ট্রী করে দিও।

আমি পারব না। তুমি আর কারো নাম করে পাঠিয়ে দাও।

কেন ? ধরা পড়বার ভয় হয় ?

হয়।

তবে আমার উকিল অঘোরবাবুকে বলে দিই। তিনি কলকাতায় থাকেন, সেখান হ'তেই পাঠিয়ে দেবেন।

সেই ভাল ; কিন্তু যদি কেউ তাঁর নিকট সন্ধান নিতে আসে—তা হ'লে ?

যেমন বুঝবেন সেইরূপ উত্তর দেবেন।

না। তাঁকে বারণ করে দিও যেন কোনরূপে তিনি তোমার নাম না প্রকাশ করেন।

আচ্ছা তাই হবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয়াবতী মরিয়াছে কিন্তু তাহার মা বাঁচিয়া আছে। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে বাসপুর গ্রামে জয়াবতীদের বাটী। সেইখানে জয়া ও তাহার জননী থাকিত। কেমন করিয়া যে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত তাহা তাহারাই জানিত। আর শুনিতে পাই গ্রামের দুই-চারিজন মন্দ লোকও তাহা জানে, কিন্তু আমাদিগের তাহা জানিয়া কোন লাভ নাই, শুনিতে বাসনাও নাই। যাক সে কথা। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, তাহার পর জানিনা কি উপায়ে জয়াবতী নারায়ণ-

জয়ার রূপের কি আদি-অন্ত ছিল ? সাক্ষাৎ দুর্গা-প্রতিমে—আহা, কিবা নাক, কিবা চক্ষু, কি ভুরুর ছিরি, কি গড়ন-পেটন, কোন খানে এক তিল খুঁত ছিল কি ?

যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, এমন কি দুইজন আধবয়সীও স্বীকার করিল যে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাবু কি কম ভালবাসতেন ? যখন যা বলেচে তখনই তাই পেয়েছে। অত বড় রাজাতুল্য লোকের নজরে পড়া কি সোজা কথা।

একথা মনে মনে প্রায়ই সকলেই স্বীকার করিল।

আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না—এ শোক কি বরদাস্ত হবে ?

ইহাতে কাহারও হয়ত সন্দেহ ছিল কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ ছাড়িল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর কি হ'ল ?

তিনি ভাল আছেন ; আলাদা জাহাজে ছিলেন কি না তাই রক্ষা পেয়েছেন।

দুজনে কি তবে আলাদা জাহাজে ছিল ?

তা ছিল বই কি, না হ'লে কুলুবে কেন ? লোকজন ত সঙ্গে কম যায়নি।

তাদের কি হ'ল ?

আহা ! সবাই ডুবেচে।

সে বেলাটা এমনই কাটিল। 'সন্ধ্যা হয়, ঘরকন্নার কাজ প'ড়ে আছে,' 'কি আর করবে বল ? তবে এখন আসি।' বলিয়া সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। জয়ার মাও একটা যা তা করিয়া সিদ্ধ পাক করিয়া লইয়া সকাল সকাল দ্বার বন্ধ করিল, আর যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া প্রতিবাসিনীগণের

অন্তঃকরণে সেই গ্রামজোড়া জাহাজ আর লাটসাহেবের কান্নার কথা জাগাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই জয়ার মা নারায়ণপুর অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িল। ক্রমে সে নারায়ণপুরে প্রবেশ করিল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বৃক্ষের শ্রেণী, সেই সব—সমস্ত পরিচিত। জয়ার মার মনে পড়িল যে এই পথ দিয়াই সে চলিত, আবার এই পথ দিয়াই বক্ষে আঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। আর সে নাই, তেমন ঝগড়া আর কখনো হইবে না, তেমন করিয়া বুক পিটিতেও আর পাইবে না। শত বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, সহস্রগুণ চীৎকারে তাহা শমিত করিতে করিতে জয়ার মা চলিল। যাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাকে শত কর্ম্ম ফেলিয়াও অন্ততঃ একবার জানালার নিকট আসিতে হইল। ক্রমে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টালিকা ঐ সম্মুখে! জয়ার কত স্মৃতি তাহাতে মাখান আছে; জয়ার মা আকুলভাবে ক্রন্দনের তোড় আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্মুখের গেট দিয়া পূর্ব্বে সে ঢুকিতে পাইত না; কারণ বাবুর নিষেধ ছিল, কিন্তু এমন ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় সে ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিয়া পড়িল যে দ্বারবানদিগের বাধা দিতে কিছুতেই সাহস হইল না। সকলেই প্রায় দশহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, চীৎকার শব্দে বুঝিলেন জয়ার মা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সে জয়াবতীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য অন্ধভাবে এক আবেদন করিয়াই নিকটে উপবেশন করিল, তাহার পর আর এক আবেদন, আর এক আবেদন, কথা শেষ না হইতেই পুনঃ পুনঃ শত সহস্র আবেদন, ভিক্ষা প্রার্থনা, কৈফিয়ৎ তলব ইত্যাদি নানাপ্রকারে সুরেন্দ্রনাথকে একেবারে

বিহ্বল করিয়া ফেলিল ; তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী মস্তক ঠোকন, দারুণ বক্ষাঘাত ও সমুষ্টি কেশাকর্ষণ প্রভৃতি আর যাহা ঘটিল তাহা সম্যক্ বিস্তারিত বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সর্ব্বশেষে জয়ার মা এই বলিয়া শেষ করিল যে তাহার আর একটি পয়সাও থাইতে নাই, এবং দয়া না করিলে হয় সে অনাহারে মরিবে, না হয় এইখানে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহার জয়াবতী যেখানে গিয়াছে সেইখানেই যাইবে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, যা হবার হয়েছে, এখন কি হ'লে তোমার চলে ?

জয়ার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল, বাবা, আমার সামান্যতেই চলবে—আমি বিধবা, কেউ নাই—কত আমার আর লাগবে ?

তবু কতটাকা চাও ?

পনের টাকা মাসে মাসে পেলেই আমার চলে।

তাই পাবে। যতদিন বাঁচবে, মাসে মাসে কাছারি হতে ঐ টাকা নিয়ে যেও।

তখন জয়ার মা অনেক আশীর্ব্বাদ করিল, অনেক প্রীতিপ্রদ কথা কহিল, তাহার পর প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর তেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল না, বরং আরো অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। জয়াবতী মরিয়াছে, মা হইয়া সে অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিয়াছে কিন্তু কিছু সুবিধাও হইয়াছে, যাইবার সময় জয়ার মা এ কথা মনে করিতে ভুলিল না।

জয়ার মা সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একেবারে চলিয়া গেল না। যে স্থানে দাসদাসীরা থাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পরিচিত দাসদাসী অনেকেই ছিল, জয়ার মার দুঃখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিল, দুই-একজন কাঁদিয়াও ফেলিল।

জয়ার মা অনেক গল্প করিল, সুরেন্দ্রবাবুর দয়ার কথাও প্রকাশ করিল; কিন্তু কথায় কথায় ক্রমশঃ যখন সে শুনিল যে তাহার জয়াবতীর স্থানে আর একজন সদ্য অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এবং বাবু তাহাকে বহু সমাদরে বাগান বাটীতে স্থান দিয়াছে তখন জয়ার মা, অন্য আকৃতি ধারণ করিল। চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল; স্থান কাল বিবেচনাহীন হইয়া সে সেইখানেই বাগানবাটীর অধিকারিণীর উদ্দেশে বহুবিধ হীনবাক্য, গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অদম্য উৎসাহে নবীন করিয়া পুনরায় সেই কেশাকর্ষণ, সেই বুক চাপড়ানি! দাসদাসীরা ভীত হইল, শান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইল, শেষে বাবুর ভয় পর্য্যন্ত দেখাইল, রাগ করিয়া বাবু টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন তাহাও বলিল, কিন্তু জয়ার মা বহুক্ষণাবধি তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। পরিশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া জয়ার মার হস্ত হইতে বহু ক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পথে আসিয়া জয়ার মা বাগানবাটী অভিমুখে চলিল। কন্যাশোক তাহার চতুর্গুণ উথলিয়া উঠিয়াছে, হিংসানল পঞ্জরে-পঞ্জরে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কন্যাকে এ মাগী ডুবাইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে তখন জয়ার মা বাগানবাটীতে প্রবেশ করিল। যে দাসী সম্মুখে পড়িল তাহার পানে ক্রোধ-কষাইত নয়নে চাহিয়া বলিল, সে ডাইনি কোথা?

সে বেচারী নূতন লোক ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া বলিল, ঐ হোথা।

সে যেমন প্রশ্ন করিয়াছিল, তেমনি উত্তর পাইল। সেও প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, জয়ার মাও উত্তরের অর্থ বুঝিতে পারিল না। আর একবার তাহার পানে সেইরূপ চাহিয়া বলিল, কোথা?

সে অঙ্গুলি হেলাইয়া যথেচ্ছা একটা দিক দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ার মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে কক্ষে-কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না; কিন্তু এ কি শোভা! কি আসবাব, কি বহুমূল্য সাজ-সজ্জা! সে পূর্ব্বে সুরেন্দ্র-বাবুর বাটীতে অনেকদিন ছিল, সেখানে বহু দ্রব্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কখনও দেখে নাই। যত দেখিতে লাগিল তত ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সমস্তই জয়াবতীর হইত, আর সে জানে—হয়ত কোন সময়ে তাহারই বা হইতে পারিত না? এইরূপে মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে সে একটা কক্ষে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাইল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিয়া জয়ার মা একজন পরিচারিকা স্থির করিল, ডাকিয়া কহিল, ওগো, তোদের গিন্নী কোথায়? অস্বাভাবিক কর্কশ বচনে সে ফিরিয়া চাহিল। জয়ার মা দেখিল তাহার সামান্য বস্ত্র, গাত্রে অলঙ্কারের নামমাত্র নাই, মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; কর্কশ কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল, বলিল, তুমি কে গা?

আমি এইখানে থাকি।

তুমি কত দিন এসেছ?

প্রায় এক মাসের কিছু অধিক।

তোমাদের গিন্নী কোথায়? তুমি বুঝি তারি সঙ্গে এসেছ?

স্ত্রীলোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে কিছু প্রয়োজন আছে কি?

প্রয়োজন আমার ঢের আছে। সেই ডাইনি হারামজাদির মুণ্ডুটা আজ চিবিয়ে খাব। বলিতে বলিতে তাহার সেই পূর্ব্বভাব, সেই রুক্ষ মুখশ্রী, সেই অমানুষিক চোখের ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল—জানিস্

আমি কে? আমি জয়ার মা, আমাকে দেশসুদ্ধু চেনে। হারামজাদি ডাইনি আমার মেয়েকে খেয়েচে—আজ আমি তাকে খাব—খাব—(দন্তে দন্ত ঘর্ষণ) খাব—খাব—খাব—সব শেষ ক'রে তবে যাব।

স্ত্রীলোকটি রুদ্ধশ্বাসে সে অলৌকিক ভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ওরে হারামজাদি তোকে খাব (বক্ষে চপেটাঘাত) ওরে আবাগি—শতেক খোয়ারি—ছেনাল—ডাইনি (মস্তকে কেশাকর্ষণ) তোকে খাব—তোকে খাব—তোকে খাব—মাকালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দেব—আর এমন ক'রে মাথা খুঁড়ে হাড় দেব (ভূমিতলে মস্তক ঠোকন) ওরে আবাগি এমনি ক'রে—এমনি ক'রে (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ)—কই কোথা সে?

যাহার উদ্দেশে এত হইতেছিল, সেই সম্মুখে বসিয়াছিল, জয়ার মা কিন্তু তাহা জানিত না, জানিলে বোধ হয় সেদিন কিছু একটা ঘটিয়া যাইত।

মালতী নিকটে আসিয়া হাত ধরিল, ধীরে ধীরে বলিল, আপনি চুপ করুন—

আমি চুপ ক'রব! তুই হতভাগী সে কথা বল্‌বার কে? আমার মেয়েকে খেয়েচে আর আমি চুপ ক'রে থাকব? (পুনরায় ভূমিতলে মস্তকাঘাত)

মালতী বুঝিল, অত মোটা কার্পেট না থাকিলে জয়ার মা সেদিন আস্ত মাথা লইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কহিল, তিনি আজ এখানে নাই।

এখানে নাই?

না।

আমি কিন্তু এক পাও এখান থেকে নড়্‌ব না—হারামজাদিকে দেখ্‌ব, খাব—তবে যাব।

মালতী অল্প হাসিয়া বলিল, যাবেন কেন? স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন; কিন্তু অনেক বেলা হ'ল, খাওয়া-দাওয়া ত এখন আপনার হয় নাই?

খাওয়া-দাওয়া? তা তখন একেবারেই করব।

আহা, মেয়ের শোক! মার প্রাণ যে কি ক'চ্চে তা আমিই জানি।

জয়ার মা ঈষৎ নরম হইল, বলিল, তাই বুঝে দেখ্‌ বাছা!

তা কি আর বুঝি নে? কিন্তু কি করবেন বলুন—মুখেও ত কিছু দুটো দিতে হয়। পোড়া পেট ত আর মানে না।

তা সত্যি কথা।

তাই বলচি, এখানেই দুটো জোগাড় ক'রে দিই—

দিবি? তা দে বাছা!

আহা! জয়াদিদি আপনার কথা কত বোলতেন।

বল্‌ত? তা বল্‌বে বৈকি! তুই তাকে দেখেচিস্‌?

আহা—কত দিন এক সঙ্গে এলাম—তাঁকে আর দেখি নি?

তুই বুঝি তার সঙ্গে ছিলি?

হাঁ, তিনি আমাকে আমার দেশ থেকে তুলে নিয়ে ছিলেন। কত কথা বল্‌তেন—তার মধ্যে আপনার কথাই বেশি হ'তো।

তা হবে বৈকি! সে আমার তেমন মেয়ে ছিল না।

তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।

আহা, অমন মেয়েও মরে! কিন্তু তোদের এ ডাইনি কোত্থেকে উঠ্‌লো?

কলকাতা থেকে।

মাগী বুঝি বাবুকে ওষুধ ক'রেচে?

শুনতে ত পাই।

কিন্তু আমি তার ওষুধ করা আজ ভেঙে দেব।

দিও—মাগী যেমন—তেমনি শোধ দিয়ে তবে যেয়ো।

তা যাব। মাগী মন্তর তন্তর কিছু জানে?

মন্তর তন্তর? শুন্‌তে পাই কামিখ্যে থেকে শিখে এসেছিল। মানুষকে ভেড়া ক'রে রাখ্‌তে পারে। এই বাবুকে এমনি ক'রেচে যে ইনি উঠ্‌তে বল্‌লে ওঠেন, বস্‌তে বল্‌লে বসেন।

জয়ার মার মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্ক মুখে বলিল, তা মন্তর তন্তর আমিও জানি।

জান্‌বে না কেন? তা আজ দুপুর বেলা যখন আস্‌বে তখন দেখিয়ে দেব।

বাণ মারতে জানে?

জানে বৈকি!

কখন আসবে?

দুপুর বেলা।

জয়ার মা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন দুপুর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ কিন্তু আমার ঢের বরাত আছে—আজ তবে এখন যাই, কাল আস্‌ব। জয়ার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

না, না, আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে যান।

বড় দেরি হবে যে।

কিছুই দেরি হবে না।

তবে শীগ গির শীগ্‌গির নে মা। তোর নামটি কি বাছা?

আমার নাম মালতী।

আহা বেশ নাম।

জয়ার মা তখন নিচে আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু আহার করিয়া লইল ; মালতী নিকটে বসিয়া দেখিল যে জয়ার মার আহার তেমন সুবিধা হইল না, উঠিয়া বলিল, তবে এখন যাই মা।

একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয় নি—জয়াদিদির কাছে আমি দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম—তা তিনি ত নেই, এখন আপনি যদি দয়া ক'রে আমাকে ঋণমুক্ত করেন !

জয়ার মা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি করি ?

সেই দশ টাকা আপনি নিন।

আমাকে তুমি দেবে ?

হাঁ। মালতী উপর হইতে দশ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

জয়ার মা অনেকক্ষণ ধরিয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বাছা তুই নিশ্চয় ভদ্দরঘরের মেয়ে।

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমরা দুঃখী লোক।

জয়ার মার চোখের কোণে একটু জল আসিল। বলিল, তা হোক্, তবুও তুই ভদ্দরের মেয়ে না হ'লে—এই দেখ্ না কেন—তা সত্যি কথাই বলি, আমার জয়ার হাতে এত টাকা ছিল কিন্তু মা ব'লে দশ টাকা কখন একসঙ্গে এমন ক'রে হাত তুলে দেয় নি। জয়ার মা চোখের কোণ মুছিল।

আমরা দুঃখী লোক কিন্তু ধর্ম্ম ত আছেন।

আছেন ; কিন্তু সবাই কি তা জানে ?

তা হোক—কাল তবে আস্‌বে ?

হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ আসব বৈকি।

আমাদের ঠাক্‌রুণকে তোমার কথা আজ তবে ব'লে রাখ্‌ব কি ?

হ্যাঁ—তা—না—তা আর ব'লে কাজ নেই। কামরূপ হইতে শিক্ষা

করা 'বাণ-মারা' বিদ্যাটা জয়ার জননীর মনে বড় শান্তি দিতেছিল না, মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জয়ার মা শুষ্ক হইয়া বলিল, তবে এখন আসি, মাঝে মাঝে তোর কাছে আস্‌ব এখন।

এসো।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ খুব হাসিয়া বলিলেন, তবে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হ'য়ে গেল ?

মালতী বলিল, ঝগড়া হবে কেন, বরং বেশ ভাব হ'য়ে গেল।

তবে ভাব ক'রে নিয়েচ ?

নিয়েচি।

কিন্তু ওর নিজের মেয়ের সঙ্গে কখন বনতো না। চিরকাল ঝগড়া ছিল।

তা শুনেচি।

কি ক'রে ?

নিজেই মনের দুঃখে আমাকে কিছু কিছু বলেচে। মন-দুঃখের কারণটা কিন্তু মালতী খুলিয়া বলিল না।

প্রথমে বাড়িতে ঢুকেই বুঝি তোমাকে খুব গালাগালি দিয়েছিল ?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমাকে দেয় নি। যে ডাইনিকে তুমি কলকাতা থেকে এনেচ, তাকেই দিয়েছিল।

সে ডাইনি ত তুমিই।

আমি কেন হ'ব ? আমি ত কলকাতা থেকে আসি নি।

তা হোক তবু ত তুমিই সে।

আমাকে সে চিন্‌তেও পারে নি। একটা দাসী মনে করেছিল।

সুরেন্দ্র ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলিলেন, তা ছাড়া অপরে আর কি মনে কর্‌তে পারে?

আমিও সেইজন্যে আজ বেঁচেছি—না হলে বোধহয় আমাকে আস্ত রাখ্‌ত না।

মেরে ফেল্‌ত?

বোধ হয়।

তার পর?

আমি বললাম, সে মাগী এখানে নেই। তাতে বল্‌লে যে সে এলেই তাকে খেয়ে ফেল্‌বে।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তোমাকে ওষুধ করেচে কি না; আমি বল্‌লাম বোধ হয় ক'রেচে, না হলে বাবু উঠতে বল্‌লে ওঠেন, বসতে বল্‌লে বসেন কেন?

আমি বুঝি, তাই করি?

কর না কি?

আচ্ছা তা দেখচি; তার পর?

তার পর জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে, সে মন্তর-তন্তর জানে কি না, আমি বল্‌লাম, খুব জানে; কামরূপ থেকে শুন্‌তে পাই শিখে এসেচে। বল্‌লে, আমিও জানি, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে মনে ভয় পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে, বাণ মারতে পারে? আমি বল্‌লাম, পারে।

সুরেন্দ্রবাবু এবার খুব জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তখন বুঝি পালিয়ে গেল?

হাঁ।

আর কখন এখানে আস্‌বে না ?

আসবে বৈ কি ; কিন্তু তোমার সে ডাইনের কাছে আস্‌বে না—আসে ত আমার কাছে আস্‌বে।

যার কাছে ইচ্ছা আসুক, কিন্তু এখন তুমি আমার কাছে এস। কাছে আসিলে হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, মালতী, আর কত দিন এমন ক'রে কাটাবে ? এমন ধারা বেশ চোখে আর দেখা যায় না।

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, গয়না পরলে কি রূপ বাড়বে ?

তোমার রূপের সীমা নাই—যার সীমা নাই তাকে বাড়ান যায় না, কিন্তু আমার তৃপ্তির জন্যেও অন্ততঃ—

গয়না পরতে হবে ?

হাঁ।

পরতে পারি কিন্তু আগে বল, আমাকে গয়না পরাতে তোমার এত জেদ কেন ?

যদি বলি তা হলে মনে দুঃখ পাবে না ?

কিছু না।

তবে বলি শোন ; তোমার এ নিরাভরণা মূর্ত্তি বড় জ্যোতির্ম্ময়ী—স্পর্শ করতেও সময়ে সময়ে কি যেন একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে—দেখলেই মনে হয় যেন আমার পাপগুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে। তোমাকে বলতে কি—তোমার কাছে বসে থাকি কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছে না বলে মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশতে পারি না ; তাই তোমাকে অলঙ্কার পরিয়ে একটু ম্লান ক'রে নেব।

মালতী নিঃশব্দে আপনার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল, প্রকাণ্ড দর্পণে

তাহা পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও দেখিল। মনে হইল সে বুঝি যথার্থই বড় উজ্জ্বল, বড় জ্যোতির্ম্ময়ী; মনে হইল পুণ্যের অতীত স্মৃতি এখনও বুঝি সে দেহ ছাড়িয়া যায় নাই, পবিত্রতার ছায়াখানি এখনও সে দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে, সহসা-নিস্তব্ধ কক্ষে, মালতীর ঈষৎ ভ্রম জন্মিল—সে দেখিল, সম্মুখে মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্ত্তি আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্ত্তি।

বিস্ময়ে, আনন্দে মালতী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথ মোহন নটবর বেশে মালতীর মন্দিরে দেখা দিলেন। গলায় মোটা মোটা ফুলের গোড়ে; জুঁই, বেলা, বকুল, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পের একরাশি মালা কণ্ঠ ও বুক ভরিয়া আছে, এক হস্তে ফুলের তোড়া, অপর হস্তে মখমল-মণ্ডিত সুন্দর সুগঠন একটা বাক্স; পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে জরির জুতা; হেলিতে দুলিতে একবারে মালতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিল, আজ আবার এ কি?

কি বল দেখি?

তা জানি না।

সুরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তুমি পূজা কর?

করি।

তবে তোমার বাড়িতে চন্দন আছে; চন্দন এনে আমাকে সাজিয়ে দাও—আজ আমার বিবাহ।

কার সঙ্গে?

আগে সাজাও, তার পরে শুনো।

মালতী নিচে হইতে চন্দন ঘষিয়া আনিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিল, এখন বল।

তা কি এখনো বুঝতে পার নি।

তাহার পর গলদেশ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহাকে পরাইলেন, মখমল বাক্স হইতে নানাবিধ রত্নজড়িত অলঙ্কার বাহির করিয়া যথাস্থানে যথাক্রমে নিবেশ করিলেন—মালতী জন্মে কখন সেরূপ দেখে নাই, বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল—সব শেষ করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, তোমাকে বিবাহ করলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হ'লে, আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে মালা আজ পরালাম, জন্ম জন্মান্তরে তা আর খুলতে পারবে না।

উভয়ের চক্ষেই জল আসিল, উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর অশ্রু মুছাইয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন বাড়ি চল—আপনার সংসার আপনি বুঝে নাও—আশীর্ব্বাদ করি এ জীবনে চিরসুখী হও।

মালতী প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষের জল আজ তাহার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার মুছিল, শতবার চক্ষু তিতিয়া উঠিল—কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, মালতী আজ পিতা-মাতার কথা মনে হচ্ছে?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

যা ইচ্ছা ছিল তাতে তুমি নিজেই বাধ সাধলে। মনে করেছিলাম আর এমন ক'রে থাকব না, তোমাকে যখন পেয়েছি তখন প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করব, আর একবার সংসারী হ'ব। তোমার পিতামাতাকে এখানে আনব—লোকে তখন যাই বলুক না কেন—আমি নিজে সুখী হ'ব। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সে আশা এখন দুরাশা।

এখন বাড়ি যাবে?

মালতী বলিল, কোথায়?

যেখানে তোমার বাড়ি—যেখানে আমি থাকি।

এটা কি আমার বাড়ি নয়?

তবে কি সেখানে যাবে না?

না।

আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দেরি করিয়া কাটে সত্য, কিন্তু তথাপি কাটে; বসিয়া থাকে না। মাধবের মৃত্যুর পর শুভদার দিনও তেমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন বর্ষা ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, পথে ঘাটে কাদা পাঁক পিছল ছিল—এখন তাহার পরিবর্ত্তে শরৎ কাল পড়িয়াছে। সে মেঘ নাই, সে কাদা পাঁক পিছল নাই—পথ ঘাট খট্‌খট্‌ করিতেছে। কখন দুই-একখণ্ড মেঘ উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশ বহিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে। তখন প্রকৃতির নিত্য ম্লান মুখ, নিত্য চোখে অশ্রু ছিল—এখন সে সব আর নাই। কখন কখন সে মুখ ঈষৎ মলিন হয়, দুই-এক ফোঁটা চোখে জলও আসে দেখিতে পাই, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসে। অতীতের স্মৃতি-জড়িত দুঃখের শেষ ক্রন্দনটুকুর মত, গগনের কোন অনির্দ্দেশ্য কোণ হইতে 'গুড়গুড়' করিয়া কখন কখন কাঁদিয়া উঠে বটে কিন্তু তাহাতে আর গভীরতা নাই। একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না একথা প্রকৃতি সতীও যেন কতক বুঝিয়াছে। পরিবর্ত্তন ভিন্ন সংসার চলে না একথা সকলেই বুঝেন—বুঝে না কেবল শুভদার সৃষ্টিকর্ত্তা! জন্মিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত! শুভদা একথা মনে করিয়া দেখে—আর দেখে শ্রীসদানন্দ

চক্রবর্ত্তী। পাড়ার পাঁচ জন দেখে—শুভদা ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতেছে, জলের কলসী কাঁকে লইয়া ধীর মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছে, গৃহকর্ম্ম করিতেছে—কিন্তু নিত্য ক্ষীণ, নিত্য বিষাদময়ী!

বর্ষীয়সীরা বলে, ছুঁড়ি আর বাঁচবে না—আহা!

সমবয়সিনীরা বলে, এমন অদৃষ্ট যেন শত্রুরও না হয়—আহা!

পিছনে 'আহা আহা' সবাই বলে কিন্তু সম্মুখে একথা বলিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। সকলেই যেন বুঝিতে পারে, এ 'আহা'টা শুভদার সম্বন্ধে খাটে না। আর একটা অন্য কিছু—যাহা জগতে নাই, যাহা এ পর্য্যন্ত কেহ কখন প্রয়োগ করে নাই—প্রয়োগ করিবার অবকাশও আসে নাই—এমন একটা শব্দ খুঁজিয়া পাইলে যেন বলিবার মত কতকটা হয়। তাহা কেহ কিছু বলে না—শুভদা আসিলে চুপ করিয়া থাকে। স্নান করিবার সময় গঙ্গার ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটায়, গোলমাল করে, হাস্য কলরবে প্রৌঢ়াদিগের শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়, এমনি অনেক উৎপাত করিতে থাকে, কিন্তু শুভদা যখন নিঃশব্দে ঘাটের সর্ব্বশেষ প্রান্তে কলসী নামাইয়া নিতান্ত অস্পর্শীয়া নীচ জাতিয়ার ন্যায় সসঙ্কোচে জলে নামে, তখন বালকবালিকারাও বুঝিতে পারে যে, এখন আর গোলমাল করিতে নাই, জল ছিটাইতে নাই—এখন চুপ করিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া জননীর বা আর কাহারো আপনার লোকের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে চলিয়া যায়, তখনও কিন্তু তাহারা পূর্ব্বভাব শীঘ্র ফিরিয়া পায় না।

শুভদা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে তাহার বিরক্তি বোধ হয়, সে সব পুরাতন কথা আলোচনা করিতে লজ্জা করে। বাড়িটা আজকাল সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইয়াছে; ছলনা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, রাসমণি প্রায় সমস্ত দিন বাটী আসেন না, আর হারাণ মুখুয্যে! তা সে আজকাল ভাল ছেলে হইয়াছে। নিত্য দুবেলা বাটী

আসে, দুই আনা চারি আনা পূর্ব্বের মত কর্জ্জ চাহিয়া লয়—আবার চলিয়া যায়। শুভদা সমস্ত দুপুরবেলাটা রান্নাঘরের মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা হয়—আবার ওঠে, ঘাটে যায়, প্রদীপ জ্বালে, রন্ধন করে—যত্ন করিয়া একথাল অন্ন বাড়িয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয়; সদানন্দকে আহার করায়। আবার সকাল হয়, আবার বিকাল হয়, আবার রাত্রি আসে।

নিত্য যেমন হয় তেমনি শুভদা আজও দ্বিপ্রহরের পরে রন্ধনশালায় শুইয়াছিল। বাহিরে পুরুষকণ্ঠে একজন ডাকিল, মাঠাকৃরুণ!

শুভদা শুনিতে পাইল কিন্তু কথা কহিল না। মনে করিল বুঝি আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছে।

সে আবার ডাকিল, বলি মাঠাকৃরুণ! কেউ বাড়ি আছেন কি?

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কে?

আমি পিওন। চিঠি আছে।

শুভদা বড় বিস্মিত হইল—চিঠি কে লিখিবে? কাছে গিয়া বলিল, দাও।

অমনি পাবে না মাঠাকৃরুণ! এখানা রেজেষ্টি চিঠি—শ্রীশুভদা দেবীর নামে, তাঁর সই দিতে হবে।

শুভদা রেজেষ্টি অর্থ তেমন বুঝিল না—বলিল, দাও—আমারি নাম শুভদা।

পিওন চিঠি বাহির করিল, স্বতন্ত্র একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল, সই দিন।

শুভদা লিখিতে জানিত—বলিল, কালি কলম দাও।

পিওন মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, কালি কলম আমি পাব কোথায়? আপনার বাড়ি, বাড়িতে কালি কলম নেই!

শুভদা বলিল, দেখি। তাহার উপর নিচে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া ললনার একটা অর্দ্ধভগ্ন দোয়াত পাইল। কালি শুকাইয়া গিয়াছে—জল দিয়া কোনরূপে একরকম করিয়া কালি প্রস্তুত হইল—কিন্তু কলম কোথায় ?

হঠাৎ শুভদার মাধবের দপ্তরের কথা মনে পড়িল। উপরের ঘরে এক কোণে একটা ছোট চৌকির উপর বসিয়া মাধব ও ছলনা পাঠ অভ্যাস করিত—ললনা তাহাদের শিক্ষক ছিল। শুভদা উপরে আসিয়া দেখিল—এককোণে সেই চৌকির উপর তেমনি ভাবে একটি ছোট কালিলিপ্ত ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডে জড়িত পড়িয়া আছে। শুভদা এদিকে বহুকাল আসে নাই। বহুকাল এদিকে চাহে নাই, এটা ললনার ঘর; ললনা মরিয়া পর্য্যন্ত আজ সে প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করিল। দপ্তরখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে খুলিল—একখানি ভগ্ন শ্লেট, একখানি অর্দ্ধেক বোধোদয়, একটা ধারাপাত, দুটো কঞ্চির কলম, একটা মুখভাঙ্গা শরের কলম, ছোট ছোট দুটি শ্লেট পেন্সিল, পুরাতন পঞ্জিকা হইতে কর্ত্তিত গোটা পাঁচেক ছবি—টপ করিয়া একটা মস্ত বড় ফোঁটা শ্লেটের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কলম লইয়া শুভদা আবার সেগুলি তেমনি সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। কারণ এগুলি মাধবের বড় যত্নের দ্রব্য তাহা সে জানিত।

নিচে আসিয়া শুভদা পত্র গ্রহণ করিল। ঘরে গিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট। নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; পিওনকে ডাকিতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল কিন্তু পিওন ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বৌমানুষ, চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না, কাজেই নোট লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুভদা মনে করিয়াছিল আর একটু পরে সে আপনিই আসিবে কিন্তু তাহা হইল না। সে সেদিনও আসিল না কিম্বা পরদিনও আসিল না। তখন শুভদা একথা সদানন্দকে জানাইল। সদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ভুল হয় নাই। এ গ্রামে আপনার নামে আর

কেউ নাই—হারাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী—তখন এ আপনারই বটে, কিন্তু কলকাতায় কে আপনার আছে ?

কলকাতায় আমার কেউ নাই।

পরদিন সদানন্দ ডাকঘরে সম্বাদ লইয়া আসিয়া বলিল, অঘোরনাথ বসু, উকিল কলকাতা হতে এ টাকা পাঠিয়েছেন।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, ও নামের কাকেও আমি চিনি না।

তবে ?

তুমি উপায় কর।

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, উপায় আর কি করব ? টাকা যদি না নেওয়া মত হয়, তা হ'লে ফিরিয়ে দিন !

বাবা, যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে পাই নাই তখনো বোধহয় এ টাকা নিতাম না। এখন কি দুঃখে টাকা নেবো ? এ আমার টাকা নয় তুমি ফিরিয়ে দাও।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ কহিল, আমি কলকাতায় গিয়ে সন্ধান নেব। এ টাকা এখন আপনি রেখে দিন—যদি ফিরিয়ে দেবার হয় ফিরিয়ে দেব।

তুমি টাকা সঙ্গে নিয়ে যাও—মত, অমত নাই—একেবারে ফিরিয়ে দিও। সম্ভব, তিনি আর কারো বদলে আমাকে পাঠিয়েছেন।

যা হয় সেখানে গিয়ে স্থির করব।

তাই করো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আপনার প্রশস্ত কাছারি ঘরে উকিল বাবু শ্রীঅঘোরনাথ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখে টেবিলের অপর পার্শ্বে নারায়ণপুরের সুরেন্দ্রনাথ বাবু বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একরাশি মকদ্দমার কাগজপত্র রহিয়াছে; ব্যস্তভাবে দুই জনে তাহারি তদ্বির করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, অঘোরবাবু, বোধহয় এ মকদ্দমা আমি জিততে পারব না।

এখনো কিছুই বলা যায় না।

বলা বেশ যায়। ঠিক বুঝছি মকদ্দমা হারতেই হবে।

কিন্তু হাইকোর্টের উপরও আছে?

আছে, কিন্তু ততদূর যাবার ইচ্ছা নাই।

তবে কি মালপুরের বিষয়টা ছেড়ে দেবেন?

না দিয়ে আর উপায় কি?

বিস্তর আয় কমে যাবে।

হাঁ, প্রায় অর্দ্ধেক কমবে।

অঘোরবাবু মৌন হইয়া রহিলেন। মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্রবাবুর অনুমানই কালে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাইরে একজন আপনার সহিত দেখা করতে চান। অঘোরবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে?

চিনি না। দেখে বোধহয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তবে বল্ গে যা এখন আমার সময় নেই।

কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তিনি যেতে চান না—বলেন বড় দরকার আছে।

অঘোরবাবু আরো একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, এ-ঘরেই ডেকে পাঠাব কি?

ক্ষতি কি?

ভৃত্যকে তিনি সেইরূপ অনুমতি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে শিখা কিন্তু কপালে ফোঁটা তিলক প্রভৃতি কিছুই নাই। অর্দ্ধ ময়লা উত্তরীয় বসন, শাদা থান পরিধানে, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা উঠিয়াছে দুজনেই চাহিয়া দেখিলেন, অঘোরবাবু বলিলেন, বসুন।

ব্রাহ্মণ অদূরে চৌকির উপর স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, উকিল বাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয়ের—

আমারই নাম অঘোরনাথ।

তবে আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। যা বলবার এইখানেই বলব কি?

স্বচ্ছন্দে বলুন।

তিনি তখন উত্তরীয় বস্ত্র হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, এ টাকা শুভদা দেবীকে কি আপনি পাঠিয়েছিলেন?

অঘোরবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, হাঁ, আমিই পাঠিয়েছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হলুদপুরে হারাণ মুখুয্যের বাটীতে শুভদা দেবীকে?

হাঁ, তাই বটে।

কেন?

মনিবের হুকুম।

মনিব কে ?

অঘোরবাবু সুরেন্দ্রবাবুর পানে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তা বলতে নিষেধ আছে।

তবে এ টাকা ফিরিয়ে নিন। যাঁকে এটা পাঠিয়েছিলেন, তিনি গ্রহণ করবেন না, আপনাকে তিনি চেনেন না, এবং সম্ভবতঃ আপনার মনিবকেও চেনেন না। আমাকে এখানে সমস্ত সম্বাদ নিয়ে নোটখানা ফিরিয়ে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা মনে করেছিলাম আপনি বুঝি ভ্রম করে একজনের স্থানে আর একজনের নাম লিখে ফেলেছিলেন।

অঘোরবাবু হাসিলেন, বলিলেন, এতটা ভ্রম উকিলের হয় না।

না হোক কিন্তু এখন প্রতিগ্রহণ করুন।

তাও পারি না—মনিবের হুকুম ব্যতীত কিছুই করব না।

তবে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে সম্বাদ দেবেন, আমি অন্যদিন এসে দিয়ে যাব। তিনি উঠিতেছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনা হইতে বলিলেন, মহাশয়ের নাম ?

আমার নাম সদানন্দ চক্রবর্ত্তী।

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন ; কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কোথায় আছেন ?

কোথায় থাকব তা এখনো স্থির করি নাই ; বরাবর এখানেই চলে এসেছিলাম এবং সম্ভবতঃ আজই ফিরে যাব।

সুরেন্দ্রনাথ অঘোরবাবুকে বলিলেন, এখন যাই, রাত্রে আবার আসব। তাহার পর সদানন্দর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।

বলুন।

এখানে নয়। আমার বাসা নিকটেই, আপত্তি না থাকে ত চলুন সেখানে যাই, সমস্ত বলব।

সদানন্দর তাহাতে আপত্তি ছিল না; তখন দুই জনে গাড়ীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে সদানন্দ কহিলেন, এর পূর্ব্বে কখন দেখেছি ব'লে মনে হয় না—কিন্তু—কিন্তু—আপনি আমাকে কখন দেখেছিলেন কি?

না, দেখি নাই; কিন্তু আপনাকে জানি:

কিরূপে?

বাসায় চলুন—সেখানেই বলব।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ী বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমিও ব্রাহ্মণ, বেলাও অধিক হয়েছে—আপনি এখানে আহার করলে ক্ষতি কি?

কিছু না।

তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শুভদা দেবী দরিদ্র নয় কি?

দরিদ্র বটে; তাই ব'লে—

বুঝেছি। তাই ব'লে দান নেবেন কেন?

কতক তাই বটে; বিশেষ দাতার নাম না জানতে পারলে—

কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? যে দান করেছে, সেই বলছে ভুল প্রমাদ কিছুই ঘটে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে।

কে দান করেছে?

ধরুন এখন অঘোরবাবুই—

অঘোরবাবুর কি অধিকার আছে?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কিন্তু দান করতে সকলেরি অধিকার আছে।

থাকতে পারে কিন্তু সকলেই গ্রহণ করে কি?

করে না; কিন্তু যার চলে না সে?

সদানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল, শুভদা দেবীর এরূপ ভিক্ষা না নিলেও চলে।

আজকাল বোধহয় চলে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে চল্‌ত কি?

সে কথার প্রয়োজন কি? আর আপনি এত জান্‌লেন কিরূপে?

আমি অনেক কথা জানি। হারাণবাবু উপার্জ্জন করেন না—অধিকন্তু আনুষঙ্গিক নানা দোষ আছে—যে আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন করে না, তার সংসার পরের সাহায্য ব্যতীত চলে কি?

সদানন্দ কিছু গোলমালে পড়িল, উপস্থিত কোনরূপ উত্তর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন, হারাণবাবু এখন কি করেন?

কিছু না।

বুঝিছি। আপনার সাহায্যে তবে তাঁর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়?

ভগবান সাহায্য করেন—আমি দরিদ্র।

ছলনার বিবাহ হয়েছে?

হয়েছে।

কোথায়? কার সঙ্গে?

আমাদের গ্রামেরই—সারদাচরণ রায়ের সঙ্গে।

মাধব কেমন আছে?

সে বেঁচে নাই—অনেকদিন মারা গিয়েছে।

আহা! তাঁর বড়মেয়েটি এখন কোথায়?

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় কিরূপ? সেও ত বেঁচে নাই।

বেঁচে নাই? মরল কিরূপে?

গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করেছিল।

কেমন করে জানলেন? মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল কি?

মৃতদেহ ভেসে ওঠে নাই; কিন্তু তার পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গাতীরে পাওয়া গিয়েছিল—তাতেই বোধহয় আত্মহত্যা করেছে।

সে বিষয়ে আর কারো সন্দেহ নাই?

কিছু না।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা মনে করুন যদি এ-টাকা সেই পাঠিয়ে থাকে?

কে? ললনা?

ললনা কে? তার নাম কি ললনা ছিল?

হাঁ।

আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম; ললনাই বটে। ললনা, ছলনা দুই বোন—না?

হাঁ।

মনে করুন দেখি যদি সে-ই এ-টাকা পাঠিয়ে থাকে?

যে মরেছে সে?

হাঁ সেই। গঙ্গাতীরে তার বস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল বলেই যে সে মরেছে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখন যদি সেই পাঠিয়ে থাকে?

সদানন্দ বড় বিহ্বল হইল। কিছুক্ষণ অধোবদনে ভাবিয়া বলিল, সে বেঁচে নাই। বেঁচে থাকলে পত্র লিখত।

পত্র লিখতে যদি তার লজ্জা বোধ হয় ?

আমি ললনাকে জানি। লজ্জার কাজ কখন সে করবে না—জীবিত থেকে কখন আত্ম-গোপন করবে না !

সে মরে নাই—বেঁচে আছে; সেই টাকা পাঠিয়েছে এবং প্রতি মাসে পাঠাবে।

সদানন্দ আপনার কপাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, আপনার নাম ?

সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিবাস।

নারায়ণপুর।

আপনি হারাণবাবুর এত কথা কি করে জানলেন ?

ললনা বলেছে।

ললনা বলে নাই—সে মরেছে !

মরে নাই—সে সুখে আছে।

সে স্বর্গে গিয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিলেন, সদানন্দবাবু আর একটু দাঁড়ান—

আমি যাই—

দাঁড়ান—আর দুটো কথা—

যদি কখন দেখা হয় বলবেন, সদাদাদা তাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করেছে—

তাঁর মাকে বলবেন—

—হাঁ—স্বর্গে গিয়েছে। সদানন্দ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর ফিরিল না—আর বসিল না।

সে চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণাবধি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে হইলে বোধহয় এখন হাসিতেন কিন্তু আজ

চক্ষু কোণে জল আসিয়া পড়িল। এই সময় বাহিরে ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, বাবু গাড়ী সাজাবো ?

হাঁ সাজাও। ছিঃ ছিঃ—এমন বিষও মানুষ ইচ্ছা করে খায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি মালতী আপনার কক্ষে বসিয়া সীতার বনবাস পড়িতেছে। অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক চোখ মুছিয়াছে, তথাপি পড়িতেছে। আহা! বড় ভাল লাগে—কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এই সময় বাহিরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বড় মোটা গলায় কে ডাকিল, ললনা!

মালতী শিহরিয়া উঠিল—হাতের সীতার বনবাস নিচে পড়িয়া গেল।

ললনা!

মালতীর বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল, কে ?

এবার হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, ললনা!

তুমি ?

হাঁ আমি; কিন্তু তুমি ধরা পড়েছ। নাম জাল করেছিলে কেন ?

কৈ ?

আবার মিছে কথা ? তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনে এলাম। ললনা ছিলে—মালতী হয়ে বসেছ।

কোথায় ?

কলকাতায়।

কলকাতায় আমাকে ত কেউ জানে না।

সেখানে কেউ তোমাকে জানে না বটে, কিন্তু যে জানে সে হলুদপুর হতে এসেছিল।

কে ?

তোমার সদাদাদা সেই নোট ফিরিয়ে দিতে অঘোরবাবুর নিকট এসেছিলেন।

নোট ফিরিয়ে দিতে ?

হাঁ—

সদাদাদা ?

সে-ই।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কথা কও না যে ?

সদাদাদা কেমন আছেন ?

ভাল আছেন ; তোমার মা ভাল আছেন—তাঁর অবস্থা এখন আর মন্দ নয় তাই তোমার দান গ্রহণ করবেন না। সদানন্দবাবু তাঁদের অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আমার নাম ললনা—এ কথা কেমন করে জানলে ?

সদানন্দ বলেছেন। তাঁরা সকলে জানেন তুমি জলে ডুবে আত্মঘাতী হয়েছ।

মালতী নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু আমি বলেছি যে তুমি বেঁচে আছ এবং সুখে আছ।

তা কেন বললে ?

তবে কি মিথ্যা বলব ? তুমি বেঁচেও আছ আর আমার বোধহয় সুখেও আছ—সুখে নাই কি ?

আছি, কিন্তু সে কথা কি সদানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল ?

না ; আমি আপনি বলেছি এবং তোমার মাকেও একথা বলতে বলেছি।

আমি টাকা পাঠিয়েছিলাম—তাও বলেছ কি ?

বলেছি।

তুমি আমার মাথা খেয়ে এসেছ। সে পাগল, একথা গ্রামময় বলে বেড়াবে। যদি তাদের নিকট মরেই ছিলাম তবে কেন বাদ সেধে আবার বাঁচালে ?

সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিলেন ; তাহার পর বলিলেন, যাকে তোমরা পাগল মনে করতে, সে স্বাভাবিক, একতিলও পাগল নয়। হয়ত সে কখন পাগল ছিল, কিন্তু সে দিন তার ফুরিয়ে গিয়েছে। তার দ্বারা হলুদপুরে তুমি কখন বাঁচবে না। তুমি যখন আত্মগোপন করেছ, সে কখন তা প্রকাশ করবে না।

কেমন করে জানলে ?

জেনেছি। যখন তোমার জীবিত থাকার কথা তোমার মাকে জানাতে বললাম, বললে, ললনা, লজ্জার কাজ কখন করবে না, আত্মগোপন কখন করবে না—সে বেঁচে নাই, মরেছে। আমি বললাম, সে সুখে আছে। সে বললে, সে স্বর্গে গিয়েছে। আমি বললাম, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান। সে বললে, আমি যাই—যদি কখন তার দেখা পান, বলবেন, সদাদাদা তাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করেছে। মালতী, আমি ঠিক বুঝেছিলাম ; যে বিষ আমি খেয়েছি—সে বিষ সেও খেয়েছে। আমার সুধা হয়েছে—তার প্রাণহন্তারক হয়েছে।

মালতী অধোবদন হইয়া শুনিতেছিল ; বড় কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু লজ্জা করিতেছিল।

আর একটা সুখবর—তোমার ছলনার বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, হয়েছে ? কোথায়, কার সহিত ?

ঐ গ্রামেই। সারদাচরণ না কে—তার সহিত।

মালতী বুঝিতে পারিল। মনে মনে তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বিবাহ করে ত সেই করবে তা কতক জান্‌তাম।

কেমন করে জানলে ? পূর্ব্ব হতে কি কথাবার্ত্তা ছিল ?

না—কথাবার্ত্তা কিছুই ছিল না—তবে আমি একসময়ে ছলনাকে বিবাহ করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তখন পিতার ভয়ে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন নাই, পরে আমি মরেছি—এই ভেবে দয়া করে বোধহয় বিবাহ করেছেন।

পিতার ভয় কেন ?

তিনি অতিশয় অর্থপিপাসু লোক। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থলাভ করবেন।

তা বদলাল কেন ? তোমার পিতা নিশ্চয়ই অর্থ দিতে পারেন নাই।

সম্ভব। মালতী মনে ভাবিল, যে ভালবাসায় তুমি ধরা দিয়াছ সারদা-চরণের সেই ভালবাসায় সারদাচরণের পিতাও ধরা পড়িয়াছে কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না।

মালতী চিন্তা করিবার আজ অনেক দ্রব্য পাইয়াছে তাই বেশি কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না ; কিন্তু মনে পড়িল মাধবের কথা। বলিল, মাধব—তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

সে ভাল আছে।

মালতীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে-রাত্রে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে জাগিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল। ভাবিল, সদানন্দ

আসিয়াছিল—টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল; আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আমিও আর পাঠাইব না। তারপর মনে করিল—সারদাচরণ! পূর্ব্বে শত ধন্যবাদ দিয়াছিল এখন সহস্র ধন্যবাদ তাহাকে মনে মনে দিল—মনে মনে বলিল, তুমি আমার অপরাধ লইও না, তখন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আর কখন তোমাকে হয়ত দেখিতে পাইব না, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন এ দয়া ভুলিব না। অন্তরে চিরদিন তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, চিরদিন করিব।

সে খুঁজিয়া দেখিল, সারদার অস্পষ্ট ছায়া এখনও সে হৃদয় হইতে পূর্ণ বিলীন হইয়া যায় নাই; আজ আরো স্পষ্টীকৃত হইল। মনে মনে বলিল, স্বামী বলেন—সে সদানন্দ, কিন্তু সে সারদা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে সদানন্দ ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথটা সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল। পথে যে কেহ ডাকিয়া বলিল, দাদাঠাকুর, কোথাকে? দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ। —কোথায় গেছ্‌লে। সদানন্দ দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাচ্চি। তাহার হালের গরু ততক্ষণ একজনের বেগুন ক্ষেতে ঢুকিয়াছে, সে গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, সদানন্দও পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। সে গরু ফিরাইয়া আনিয়া আপনা আপনি বলিল, ক্ষেপার মনটা আজ দেখচি বড় ভাল নয়, বেশ লোকটি!

রামুমামা নন্দ ময়রার দোকান ঘরের চৌকাঠ ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছিলেন, এক পা ধূলা সদানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, ও সদানন্দ, চার-পাঁচ দিন তোমাকে দেখি নি ছিলে কোথা?

সদানন্দ না ফিরিয়া পশ্চাৎ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওখানে।

কোথায়? বামুনপাড়ায়?

হুঁ।

এতদিন ধরে?

হুঁ! সদানন্দ হন হন করিয়া চলিতে লাগিল।

রামুমামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হুম্, কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

সদানন্দ সে কথা শুনিল না বা শুনিতে পাইল না, একেবারে শুভদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটখানা নিকটে রাখিয়া বলিল, কোন সন্ধান হ'ল না।

শুভদা বলিলেন, তবে মিথ্যে ক্লেশ পেলে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

শুভদা আবার বলিলেন, তবে এ-টাকা নিয়ে কি করব?

আপনার যা ইচ্ছা। টাকা আপনার ইচ্ছা হয় বিলিয়ে দিন, না হয় রেখে দিন, যদি কখন সন্ধান পাওয়া যায়, ফিরিয়ে দেবেন।

শুভদা অগত্যা তাহা বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিল।

সদানন্দ বলিল, হারাণকাকা কোথায়?

শুভদা পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া বলিল, শুয়ে আছেন।

কোথাও যান নাই?

গিয়েছিলেন—এই মাত্র ফিরে এসেছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড়বৃষ্টি করিয়া আসিল। শুভদা সকাল সকাল রন্ধনাদি শেষ করিয়া লইলেন। হারাণবাবু আহারাদি করিয়া বলিলেন, কিছু পয়সা দাও।

আজ আর কোথাও যেও না; আকাশে মেঘ ক'রে আছে, রাত্রে যদি জল হয়?

হ'লেই বা।

তা হলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে।

কিছু না। আজ অনেক কাজ আছে; যেতেই হবে।

কাজ যাহা ছিল শুভদা তাহা জানিত। তথাপি কহিল, আজ একাদশী; ঠাকুরঝির আবার অসুখ হয়েছে—অঘোরে প'ড়ে আছেন।

হারাণ তাহা শুনিলেন না। ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, তালি দেওয়া চটি জুতা হাতে লইয়া কোঁচা গুঁজিয়া জল-কাদার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শুভদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বভাব!

সে যথার্থই অনুমান করিয়াছিল ; রাত্রি একপ্রহর না হইতেই আবার বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজকাল প্রতি রাত্রে শুভদার অল্প অল্প জ্বর হইত ; কিন্তু একথা কাহাকেও বলা দূরে থাক সে একরূপ নিজেকেই জানিতে দিত না। রাত্রে যখন শীত করিয়া জ্বর আসিত তখনই মনে পড়িত।

বৃষ্টি পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল, হাতের নিকট যাহা পাইল তাহাই টানিয়া গায়ে দিতে লাগিল ; অনেক রাত্রে শুভদার তন্দ্রা বোধ হইল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত শরীরে তন্দ্রার মোহে শুভদার বোধ হইল কে যেন দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া জীর্ণ অর্গলটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে —তাহার পরেই খট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু চাহিয়া সেই আলোকে দেখিল, একজন লোক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে ; তাহার হস্তে বংশের যষ্টি, সমস্ত বদন, অঙ্গ মসিলিপ্ত, তাহার উপর শাদা শাদা চূণের ফোঁটা। শুভদা শিহরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কে গো!

চুপ! সে বজ্র গম্ভীরস্বরে শুভদা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে বার দুই ঠক্ ঠক্ করিয়া লাঠির আওয়াজ করিয়া শয্যার নিকটে আসিয়া কহিল, তোর বাক্সের চাবি দে। গলাটা বড় মোটা, ভারি। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় বুঝিবা সে চেষ্টা করিয়া এরূপ মোটা গলায় কথা কহিতেছে।

শুভদা কথা কহিল না।

সে আবার সেইরূপ স্বরে লাঠিটা আর একবার সানের উপর ঠুকিয়া বলিল, চাবি দে না হলে গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব।

এবার শুভদা উঠিয়া বসিল, বালিশের নিচে হইতে চাবির থোলো

লইয়া নিকটে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলিল, আমার বড় বাক্সর ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে ; তাই নিও—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে তাতে যেন হাত দিও না। যেরূপ শান্তভাবে সে কথাগুলি বলিল, তাহাতে বোধ হয় না যে আর তাহার তিলমাত্রও ভয় আছে।

চূণকালি-মাখা পুরুষ চাবি লইয়া বড় বাক্স খুলিল, বাম দিকে খোপে হস্ত নিক্ষেপ করিল না, ডান দিকের খোপ হইতে নোট লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। শুভদার কথামত সে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বাক্স খুলিল এবং ডান দিকের খোপের সন্ধান করিয়া লইল তাহাতে বোধ হয় যেন এ সকল তাহার বিশেষ জানা-শুনা আছে।

সে চলিয়া যাইবার সময় শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে কহিল, নোটে বোধহয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙিও।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬